সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ৪১-৪২
বার : সোমবার

২৪ জুলাই- ২০২৩ ঈসায়ী
০৯ শ্রাবণ- ১৪৩০ বাংলা
০৫ মুহার্‌রম- ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
জনাব চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **ইসলামে হারাম মাসসমূহ ও আমাদের করণীয়**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
- ☐ **প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা** ০৬
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখগাথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ০৭
  - ❖ **আল কুরআনে একটি ঘটনা ও কিছু শিক্ষা**
    শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী- ১০
  - ❖ **গোপন পাপকর্ম জনসম্মুখে প্রকাশ : পরিণতি ভয়াবহ**
    গ্রন্থনায় : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল- ১৪
  - ❖ **ইন্‌শা-আল্লাহ না বলার কুফল**
    ডা. সুলতান আহমদ- ১৭
  - ❖ **বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ**
    মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন- ১৮
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মেহমানদারী**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৩
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ২৫
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **শিক্ষার্থী নিপীড়ন (Bullying) বন্ধে আজই সচেতন হোন**
    মো. আরিফুর রহমান- ২৬
- ✍ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - ❖ **শহীদি রক্তে স্নাত ঐতিহাসিক কারবালা**
    সহ. অধ্যা. মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম- ২৯
- ✍ **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **সা'ঈদ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র লোমহর্ষক কাহিনী**
    আবু তাসনীম- ৩৩
- ✍ **কবিতা** ৩৫
- ✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৬
- ☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৩৮
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- ✍ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

আশুরায়ে মুহার্‌রাম ও আমাদের ভাবনা

বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ'র তাহজিব-তামাদ্দুন, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও 'ইবাদত-বন্দেগির সাথে হিজরি সনের সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য। বলা যায় যে, হিজরি সনের চান্দ্রমাস ও তারিখকে ঘিরেই মুসলিম উম্মাহ'র জীবন আবর্তিত। বছরকে বারো মাসে বিভক্ত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা, যা পবিত্র কুরআনে সূরা আত্-তাওবার ৩৬ নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে। বারো মাসের প্রথম মাস 'মুহার্‌রম'। এটি হারাম বা সম্মানিত মাস। মুহার্‌রম ছাড়াও জিলক্বাদ, জিলহজ্জ ও রজব মাসকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন। এই ৪টি মাসের পবিত্রতা রক্ষার্থে আল্লাহ এ সময়ে যে কোনো রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ-বিবাদকে হারাম করেছেন। এই মাস চতুষ্টয়ে মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ব্যাবসা-বাণিজ্য, চলাফেরা, 'ইবাদত-বন্দেগি এবং কা'বার তাওয়াফ করতে পারে, এটিই এ মাস চতুষ্টয়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আমরা জানি যে, হিজরি দিনপঞ্জির আনুষ্ঠানিক গণনার শুভ সূচনা হয় আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকে উপলক্ষ্য করে। এই হিজরি সনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন খলিফাতুল মুসলিমিন 'উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তখন থেকে মুহার্‌রমকে প্রথম মাস ধরে হিজরি সনের আনুষ্ঠানিক গণনা শুরু হয়। যদিও চান্দ্রমাস ভিত্তিক বছর গণনা শুরু হয় পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে। মুহাররম মাস যেমন তাৎপর্যমণ্ডিত; তদরূপ বহুবিধ ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এ মাসটির স্বকীয়তা স্মরণীয়। তবে হিজরি সনের প্রথম মাসকে কেন্দ্র করে বর্ষবরণ ও মাতম আমাদের সমাজের সর্বাধিক নিন্দনীয় ও শরয়িত বিবর্জিত কর্ম। কেননা, বর্ষবরণ যেমন বিজাতীয় ও অমুসলিমদের সংস্কৃতি; তদরূপ মাতমও শিয়া সম্প্রদায়ের উৎকট ও উদ্ভট এক অভিনব উদ্ভব। তাই মুসলিম উম্মাহ'র সাথে এ দুইয়ের কোনো দূরতম সম্পর্ক নেই। এ মাসকে ঘিরে মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে এমন সব কল্পকথার প্রচলন ঘটেছে যা রূপকথার কাহিনীকেও অতিক্রম করেছে। বিশেষ করে কারবালার মরুপ্রান্তরে প্রিয়নবী (ﷺ)-এর দৌহিত্র হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদতকে ঘিরে যে আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালিত হচ্ছে– তা সর্বৈব বিবর্জিত অপসংস্কৃতি বৈ আর কিছু নয়।

তাছাড়া এই মাসকে ঘিরে আমাদের মাঝে যে সকল ভ্রান্ত কথার প্রচলন রয়েছে তার অধিকাংশই মুসলিম উম্মাহ'র 'আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– আশুরার দিনে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন, এ দিনে লাওহে মাহফুয ও আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনে তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন, এ দিনে জিবরাঈল আমীন ও ফেরেশ্‌তাকুলকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইত্যাদি। এছাড়াও আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মসহ পরবর্তী নবী-রাসূলগণের সাথে সংস্রব বহু ঘটনাকে এ দিনের সাথে সম্পৃক্ত করে এরূপ আরো অনেক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে– যার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আরবের কুরাইশগণ এ দিনে সিয়াম পালন করতেন। মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশুরার সিয়াম রেখেছেন। মদীনায় হিজরত করার পর দেখতে পেলেন- সেখানের ইয়াহুদীরা ঐ দিন সিয়াম পালন করছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল- এদিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে জালিম বাদশাহ ফিরআউন ও তার অত্যাচার থেকে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও বানী ইস্‌রাঈলকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাউনকে সৈন্যসামন্তসহ মর্মন্তুদভাবে সলিল সমাধি করেছিলেন।

এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) ঐ দিনে সিয়াম পালন করেন। আমরাও তার অনুসারী হিসেবে এ দিনে সিয়াম পালন করছি। তদুত্তরে আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন : মূসা'র অনুসরণের বিষয়ে তোমাদের চেয়ে আমরা বেশি হক্বদার। এ বলে তিনি সিয়াম পালন করেন এবং তাঁর উম্মতকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছর রামাযানের সিয়াম ফর্‌য করা হলে রাসূল (ﷺ) আশুরার সিয়ামকে ঐচ্ছিক করে দেন। যে চাইবে সে সিয়াম পালন করবে। আর বিনিময়ে পাবে বিগত এক বাছরের গুনাহ থেকে পরিত্রাণ। কিন্তু মনস্তাপ এখনে যে, রাসূলের সুন্নাহ পালনে আমাদের নেই কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা, আর না আছে আগ্রহ বা স্পৃহা। ফলে মুসলিম সমাজের এক শ্রেণি 'ইবাদতের মধ্য দিয়ে আশুরা পালনের বদলে কথিত আনুষ্ঠানিকতায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর শিয়াদের অপসংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার-প্রসার দেখে ক্রমশঃ বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাই উম্মাহকে এ বিষয়ে বেশি বেশি সতর্ক করা প্রয়োজন। ঘটাচক্রে ৬১ হিজরীতে ঘটে যাওয়া কারবালার ঘটনার সাথে মুহর্‌রমের সিয়ামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

পরিশেষে দৃঢ়চিত্তে এ কথা বলতে চাই যে, নবীদৌহিত্র হাসান-হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-সহ সকল আহলে বাইতগণ আমাদের কাছে সম্মানিত। তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও মমতা যেমন মনের মণিকোঠায় লালিত; তদরূপ কারবালার ঘটনায় আমাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণও অব্যক্ত। তবে কারাবালার ঘটনাটি ইসালামের ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায়; ইসলামী শরিয়তের সাথে এর কোনো সংস্রব বা সম্পৃক্ততা নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান ও বিশুদ্ধ 'আমলের যোগ্যতা দান করুন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

ইসলামে হারাম মাসসমূহ ও আমাদের করণীয়

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

সরল অনুবাদ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধানে আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে গণনায় মাস ১২টি। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সু-প্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা সমবেতভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারাও তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন।"[১]

মহান আল্লাহর কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য

ইমাম আবূ জা'ফর (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : মাসের গণনা মহান আল্লাহর কিতাবে ১২টি। এখানে মহান আল্লাহর কিতাব বলতে ঐ কিতাব উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফায়সালায় যা ঘটবে– তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।[২] ইমাম সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : কিতাবুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত ফলক।[৩] ইমাম বাগাভী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : এখানে মহান আল্লাহর কিতাব দ্বারা মহান আল্লাহর হুকুম উদ্দেশ্য। কারো মতে লাওহে মাহফুজ তথা সংরক্ষিত ফলক উদ্দেশ্য।[৪] ইমাম কুরতুবীও (রহিমাহুল্লাহ-র) একই মত পোষণ করেছেন।[৫]

হারাম মাসসমূহ

এখানে হারাম বা সম্মানিত মাস দ্বারা রজব, যুলকা'দাহ, যুলহাজ্জাহ ও মুহার্‌রাম উদ্দেশ্য। আর এ চার (৪) মাসকে হারাম এ জন্য বলা হয় যে, এ মাস চতুষ্টয় অতি সম্মানী এবং এগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম।[৬] শাইখ আবূ বক্‌র আল-জাযায়েরী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : এ চার মাসে যুদ্ধ হারাম এ কারণে যে, এগুলোতে আরবরা যেন নির্বিঘ্নে ব্যবসায়িক সফর ও হজ্জ-'উমরাহ্ আদায় করতে পারে। যাতে কেউ কোনো প্রকার ভয়-ভীতি না পায়।[৭] উপরোক্ত ৪টি মাসকে জাহেলী যুগেও সম্মান করা হতো। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ-র) বর্ণনা করেন, আবূ রাজা আল-উত্বারেদী বলেন : আমরা (জাহেলী যুগে) পাথরের পূজা করতাম। যে পাথরটির পূজা করতাম, তার চেয়ে ভালো পাথর পেলে ঐ পূজাকৃত পাথরটি ছুড়ে ফেলে অন্যটি গ্রহণ করতাম। আর যখন পাথর পেতাম না, তখন ধুলা-বালু জমা করে তাতে ছাগলের দুধ দোহন করে সেটি প্রদক্ষিণ করতাম। আর কখনও হাত হতে অস্ত্র বাদ দিতাম না। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাস রজব আসতো, তখন তীর-ধনুক ছেড়ে দিয়ে নিরস্ত্র হতাম।[৮]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

"আর তোমরা তাতে তোমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করো না" –দ্বারা উদ্দেশ্য কি, তা বুঝাতে দু'টি উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

(এক) এ মাসগুলোতে তোমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা নিজেদের উপর অত্যাচার করো না। ইবনু জুরায়িয (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : আত্বা বিন আবি রাবাহ কসম করে বলেন : এ মাসগুলোতে তোমাদের সাথে কেউ যুদ্ধ না করলে তোমরাও যুদ্ধ করো না।

★ *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

১. *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।*
২. *ইমাম ইবনু যারীর আত্ তাবারী 'জামিউল বয়ান'- ১৪/২৩৪।*
৩. *তাফসীর ইবনু আবী হাতিম- ৬/১৭৯১।*
৪. *তাফসীর আল-বাগাভী- ২/৩৪৫।*
৫. *আল কুরতুবী 'আল-জামিউলি আহকামিল কুরআন'- ৮/১৩২।*
৬. *আ. রহমান আল-সা'আদী 'তাইসীরুল কারীমির রহমান'- ১/৩৩৬।*
৭. *আবূ বকর আল-জাযায়েরী 'আইসারুত্ তাফাসীর' ২/৩৬৫।*
৮. *সহীহুল বুখারী, তাফসীর আল-কুরতুবী- ৮/১৩৪।*

(দুই) আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– এ মাসসমূহে তোমরা কোনো পাপে জড়িত হইও না।[৯] কেননা, এ মাসগুলোতে পাপের ভয়াবহতা অনেক বেশি।[১০] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : তোমরা সবক'টি মাসেই যুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে নিবৃত রাখো। এখানে বারো মাসের মধ্যে ৪টি মাসকে খাস করে এ মাসসমূহে পাপ-পুণ্যের আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে।[১১] অর্থাৎ- ১২ মাসেই অন্যায়-অবিচার হারাম। বিশেষতঃ উল্লেখিত ৪ মাসে কোনো অপরাধ ঘটলে তার ভয়াবহতা কঠিন হবে। অনুরূপভাবে সকল মাসেই নেকী অর্জন করতে হয়। তবে এ চার (৪) মাসে কোনো ভালো কাজ করলে তার প্রতিদানও অনেক বেশি হবে। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র বক্তব্য সে কথাই প্রমাণ করে। ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : সম্মানিত মাসসমূহে নেক 'আমল অধিক পুণ্যময়। আর যুলুম বা পাপ অনুরূপভাবে অধিকতর ভয়াবহ।[১২]

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উৎসাহ প্রদান করে বলেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন।" সফলতার অন্তরালে যে শক্তি কাজ করে, তা হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। আর তাক্বওয়াশীলদের সাথে রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এর অর্থ : তাদের সাথে রয়েছে মহান আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক্ব।[১৩]

দারসের শিক্ষাসমূহ

১. মাস ও বর্ষ গণনা মহান আল্লাহর সৃষ্টি নৈপূণ্যের আদিম স্বাক্ষর।

২. লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ বিধি অনুসারে সবকিছু পরিচালিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞানানুযায়ী করে থাকেন।

৩. সব ক'টি মাসেই নেকীর প্রতিযোগিতা করতে হবে এবং সকল প্রকার নাফরমানী ছাড়তে হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো মাস, দিন বা সময়কে গুরুত্ব দেন, তখন তা বিবেচনায় নিয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া আমাদের প্রতি আবশ্যক।

৫. যে সময় বা স্থানে নেকী বেশি, ঠিক সেই সময় ও স্থানে পাপ করলেও তার পরিণাম মারাত্মক হয়। ❑

[বি. দ্র. বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হওয়ায় পুনঃপ্রকাশীত হলো]

---

[৯]. *তাফসীর আল কুরতুবী- ৮/১৩৪।*
[১০]. *ইবনু কাসীর "তাফসীরুল কুরআনিল আজীম"- ৪/১৩০।*
[১১]. *প্রাগুক্ত- ৪/১৩১।*
[১২]. *তাফসীর আল বাগাভী- ৪/৪৪।*
[১৩]. *তাফসীর আল মানার- ১০/৩৫৯।*

ঘুষের লেনদেন স্পষ্ট হারাম

–মেহেদী হাসান সাকিফ*

ঘুষের লেনদেন আমাদের সমাজে মহামারি আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন অফিস-আদালতে ছোট-বড় প্রায় সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঘুষ গ্রহণের কথা কারও অজানা নয়। অনেক ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ঘুষের প্রচলন কমার নামগন্ধ নেই; বরং তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলামে ঘুষ গ্রহণ কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৮)*

অন্যায় সুবিধা গ্রহণের জন্য যেকোনো ধরনের সুবিধা ও আর্থিক লেনদেনকেই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত করে ইসলাম। তা যে নামেই প্রচলিত থাকুক না কেন। হাদিয়া, বকশিশ, উপরি আয়, অফিস খরচ, চা-নাশতার খরচ-যে নামেই ডাকুন, ইসলামে তা ঘুষ হিসেবেই গণ্য হবে। রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে এক কর্মচারী কিছু সম্পদ এনে (সেখান থেকে কিছু আলাদা করে) বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মাল) সম্পদ আর এটি আমাকে দেওয়া হাদিয়া।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,

'সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না কেন-তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না?' *(বুখারী)*

ঘুষগ্রহীতা নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য যোগ্য ব্যক্তির অধিকার নষ্ট করে। অনেকে ঘুষের বিনিময়ে অন্যায়-অনাচারের অনুমোদন দিয়ে দেয়। নবী (ﷺ) ঘুষের লেনদেনে জড়িত সবাইকে অভিশপ্ত বলেছেন। *(সহীহ মুসলিম)* অন্য হাদীসে এসেছে– রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামি।' *(তাবরানি)*

ঘুষের কারণে বড় বড় পদে অযোগ্যরা বসে যাচ্ছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বড় ক্ষতির কারণ। তাই ইসলামে ঘুষের লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘুষের মতো অবৈধ আয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের 'ইবাদত কবুল করবেন না আল্লাহ তা'আলা। হাদীসে এসেছে– 'বৈধ আয়ের 'ইবাদত ছাড়া কোনো 'ইবাদতই মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছানো হবে না।' *(সহীহ মুসলিম)*

---

* *গ্রাম : দত্তপাড়া, হাসানলেন, পোস্ট অফিস : এরশাদ নগর, টংগী, গাজীপুর।*

জান্নাতে বাড়ি যাদের জন্য বরাদ্দ

সংকলন ও ভাষান্তর : শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম মুহাম্মাদ আব্দুল হালিম আল মাদানী (হাফিজাহুল্লা-হ)

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

(٦) إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : نعم، فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول : ماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.

(৬) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশ্‌তাদের ডেকে বলেন 'তোমরা আমার বান্দার আদরের সন্তানের জান কবজ করেছো? তারা বলে– হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা আবার বলেন : 'তোমরা আমার বান্দার কলিজার ধন কে কেড়ে নিয়েছো? তারা বলে– হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন : 'আমার বান্দা এই পরিস্থিতিতে কি বলেছে'? তারা বলবে– সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' বলেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : "তোমরা আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করো, আর তার নাম দাও 'বায়তুল হামদ'"। *(সহীহুল জামে'- হা. ৭৯৫)*

(٧) ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثمَّ صلى لله في كلِّ يومٍ ثنتي عشرة ركعة، تطوعاً غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة.

(৭) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং ওযূটা পূর্ণরূপে সম্পাদন করে, অতঃপর প্রতিদিন ফর্‌য বাদে ১২ রাকআত নফল সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করবেন। *(সহীহুল জামে'- হা. ৫৭৩৬)*

(٨) أن رسول الله ﷺ قال : من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة.

(৮) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলে– আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর জন্যই প্রশংসা, তাঁর জন্যই রাজত্ব, তিনিই জীবিত করেন আবার তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জিব, তাঁর হাতেই রয়েছে কল্যাণ, আর তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। এই দু'আ পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে ১০ লক্ষ্য নেকী লিখে দেন, ১০ লক্ষ্য পাপ মোচন করে দেন এবং তার মর্যাদা ১০ লক্ষ্য গুণ বাড়িয়ে দেন এবং জান্নাতে তার জন্য বাড়ি নির্মাণ করেন। *(সহীহুল জামে'- হা. ৬২৩১)*

(٩) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

(৯) আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের যিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮০০)*

(١٠) إن في الجنة غرفا، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام.

(১০) রাসূল (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয়ই জান্নাতে কিছু ঘর রয়েছে, সেগুলোর বাইরে থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা সেগুলো প্রস্তুত করে রেখেছেন ঐ বান্দার জন্য যে অপরকে খাদ্য খাওয়ায়, সালামের প্রসার ঘটায় এবং লোকে যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সে সালাতে লিপ্ত থাকে। *(সহীহুত্ তারগীব- হা. ৬১৮)*

প্রবন্ধ

নিজভূমে পরবাসী : বিশ্বময় মুসলমানদের দুঃখগাঁথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[নবম পর্ব]

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার জন্ম দিচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে অসত্যকথন ও অপবাদ। আজগুবি ও যুক্তিহীন ধারায় ধর্মের অসারত্ব প্রমাণের নোংরা খেলা জমে উঠেছে। শয়তানের প্ররোচনায় মুখরোচক আলোচনা যেন সমাজের নিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে। মানব জাতির উত্থান ও বিকাশে যে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা হলো ধর্ম। ধর্ম হলো– Religion is a range of social-cultural systems, including designated behaviors and practices, morals, beliefs, worldviews, texts, sanctified places, prophicies, ethics or organisations that generally relate humanity to supernatural, transcedental and supernatural elements.[১৪] সুতরাং জীবন সমগ্রতার বিশাল অঙ্গনে ধর্মকে বাদ দিয়ে কিছুই কল্পনা করা যায় না।

ধর্মকে সুচারুরূপে মানব জাতির মাঝে ক্রিয়াশীল করার স্থায়ী উপায় হিসেবে ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ সে কারণে যুগে যুগে মানবজাতির কল্যাণে ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইসলামি দর্শনের আলোকে প্রেরিত ধর্মগ্রন্থসমূহ প্রণিধানযোগ্য। শতাধিক পুস্তিকা (সহিফা) ও প্রধান ৪টি ধর্মগ্রন্থ যবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন দিশেহারা মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছে। জীবন-জীবিকার অর্থবহ ভাবধারার প্রেরণা মানবমণ্ডলীকে সুশৃঙ্খল ও সমুন্নত করেছে। অথচ আজ দেশে দেশে বিশেষতঃ ইউরোপে ধর্মহীনতার সয়লাব মানবজাতিকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে চলেছে। মার্টিন স্কোরসিজ পরিচালিত The Last Temptation of Christ ম্যুভিতে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে কিতাবীয়ানদের[১৫] মাঝে ঘৃণ্যময়তা ছড়িয়েছে। হালে তোরাহ এবং বাইবেলের বিরুদ্ধেও বিষোদগার শুরু হয়েছে। এতে করে বিশ্বের ধর্মানুরাগী সম্প্রদায়ের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। হিংসা-প্রতিহিংসার দাবানলে ছারখার হতে চলেছে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন।

ইউরোপে আগে যে কোনো সময়ের চেয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আল্লাহর পবিত্র বাণী ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদ পুড়িয়ে ফেলার ধৃষ্টতা দেখানো হয়েছে। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর মু'জিযা বা বিস্ময়কর আলৌকিক শক্তি হলো কুরআন। রাসূল (ﷺ)-এর আবির্ভাবকালে কাব্য ও সাহিত্য চর্চার দিক থেকে আরবরা ছিল শীর্ষস্থানীয়। আল্লাহ একজন নিরক্ষর লোকের কাছে এমন উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নাযিল করলেন যার– ভাষা ও ভাবের সুউচ্চ মান দর্শনে আরবরা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। ভাষার গাঁথুনি ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে কুরআনের মোকাবেলা করা যেমন আরবদের জন্য দুষ্কর ছিল– তেমনি ভাব ও বিষয়াবলীর দিক দিয়েও অনুরূপ গ্রন্থ তৈরি করা তাদের জন্য ছিল অসম্ভব।

পৃথিবীকে আলোকিত করতে এই কুরআন নূর বা আলো হয়ে এসেছে। অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতিকে সত্যিকার আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য কুরআন হলো নূর বা আলো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ○ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেন এবং তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়েত দেন।"[১৬] সে সময়েও কুরআন মাজীদের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্রিকতা, প্রযোজনা ও উপস্থাপনা চমৎকার আবহ সৃষ্টি করেছিল। নির্ভুল ও গঠনতাত্ত্বিক ভাবধারার উন্মীলন মানুষকে আশান্বিত করেছে। ইহ-পরকালের সমূহ কল্যাণের সঠিক দিশা উপহার দিয়ে ধন্য করেছে। এই কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সঠিকতার গ্যারান্টি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১৪] "Religion-Defination of Religion by Merriam webster" Arehived from the organisalion, 12 March 2023. Retrievel 16 December 2019।

[১৫] আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী মানবমণ্ডলী।

[১৬] সূরা আল মায়িদাহ্ : ১৫-১৬।

অর্থ : "এটা সেই কিতাব যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এটি মুত্তাকীদের পথ নির্দেশনা দেয়।"[১৭]

কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا﴾

অর্থ : "হে নবী! আপনি বলে দিন, সব মানুষ ও জিন্ মিলে যদি এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য একত্র হয় এবং পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।"[১৮]

কুরআন মাজীদের দৃষ্টির প্রসারতা, ভাবের গাম্ভীর্য, কল্যাণবহ নসিহত, যেমনি চমকপ্রদ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ, ওয়াহাদানিয়াতের নিশ্ছিদ্র পাটাতন অসামান্য ও অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে বিঘোষিত হয়েছে,

﴿أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾

অর্থ : "হে নবী! তারা কি বলে কুরআন আপনি তৈরি করেছেন? আপনি বলুন, তোমরাও দশটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।"[১৯] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন। কুরআনের ন্যায় দশটি নয় একটি ছোট্ট সূরা পারলে রচনা করে নিয়ে এসো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পুনর্বার ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾

অর্থ : "কুরআন এমন জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে ফেলবে। তবে এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সব বিষয়ে বিশ্লেষণ করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে। মানুষ কি বলে যে, এটি আপনি বানিয়েছেন? (হে নবী!) আপনি বলে দিন, 'তাহলে তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো এর মতো একটিই সূরা। আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে সক্ষম হও ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো'।"[২০]

যুগযুগ ধরে এখন পর্যন্ত নানা উপায়ে কুরআন মাজীদ নির্ভুলভাবে অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অথচ প্রতি শতাব্দীতেই কুরআনের বিরুদ্ধে নিষ্ফল ষড়যন্ত্র অব্যাহত থেকেছে। কুরআনকে নিঃশেষ করার জন্য চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র জারি রেখেছে। কুরআনকে বিকৃত, কুরআনে ভুল সংযোজন ও কোরআনের শিক্ষা বন্ধসহ কুরআনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় 'সৌদি গেজেট ও আল আরাবিয়া' সূত্রে জানা গেছে যে, ৭০ হাজার জাল কুরআন জব্দ করা হয়েছে। হজ্জ মৌসুমে এ সকল জাল কুরআন বিতরণের মাধ্যমে ঈমান লুট করার এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র দৃশ্যমান হয়েছে। খবরে প্রকাশ ট্রাকে করে এসব জাল কুরআন বহন করা হচ্ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ মক্কা নগরীর প্রবেশ পথে 'আল-জামুস' গ্রামের কাছে ট্রাকটি ধৃত হয়।

ট্রাক ভর্তি জাল কুরআন ধরা পড়েছে সংবাদটি যেমন শিহরণকারী তেমনি ভাবনার উদ্রেক করে যে, এ ষড়যন্ত্রের উৎস কোথায়? কারা এর সাথে জড়িত! জাল কুরআন কোথায় এবং কখন ছাপা হয়েছে? জালিয়াতির ধরণ কী? আংশিক না-কী সম্পূর্ণ জাল করা হয়েছে। মক্কা শরীফে এ জাল কুরআন বিনা বাধায় কীভাবে প্রবেশ করতে পারলো? সত্তর হাজার বাদেও জাল কুরআনের সংখ্যা কত এবং অন্যান্য স্থানে জাল কুরআন বিলি বন্টন হবে না বা হয়নি তা কে বলবে?

কুরআনের আয়াত এবং অর্থ বিকৃত করার ঘটনা সবযুগেই দেখা গেছে। কুরআনের প্রতি অসম্মান অমর্যাদা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত অহরহ দেখা যায়। মিসরের জামাল নাসেরের আমলে কুরআন বিকৃতিকরণের ঘটনা আজও মানবমণ্ডলীকে নাড়া দেয়। নাসের সরকারি নির্দেশ জারী করে বিকৃত কুরআনের সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে বিনষ্ট করেছিলেন। এর মাত্র অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে আবারও ৭০ হাজার জাল কুরআনের সংবাদ বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়কে হতবাক করে তুলেছে।

কুরআন মাজীদ জাল কিংবা তাহরীফ সাধনের মধ্যেই ষড়যন্ত্র সীমাবদ্ধ থাকেনি, অবজ্ঞা ও অমর্যাদার শেষটুকুও করতে ছাড়েনি। সম্প্রতি সুইডেনে আবারও কুরআন পোড়ানোর মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা বিশ্ববাসীকে দেখতে হয়েছে। সুইডেনের স্ট্রার্স কুর্স নামের একটি কট্টর পন্থী রাজনৈতিক দল কুরআন পোড়ানোর ঘটনাটি ঘটিয়েছে। দলটির নিন্দিত নেতা রাসমুস পালুডান নামের ড্যানিশ বংশোদ্ভূত একজন সুইডিশ নাগরিক। দলটি সুইডেনে ইসলাম নিষিদ্ধ ও পশ্চিমা নয়, এমন

[১৭] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২।
[১৮] সূরা বানী ইসরাঈল : ৮৮।
[১৯] সূরা হূদ : ১৩।
[২০] সূরা ইউনুস : ৩৭-৩৮।

লোকজনকে বিতাড়িত করার পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। তার নেতৃত্বে গত ১৪ এপ্রিল সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় লিঙ্কোপিং শহরে পবিত্র কুরআনের কপি পোড়ায়। শুধু তাই নয়; আগামীতে আরো কুরআন পোড়ানোর ঘোষণা দেয় রাসমুস পালুডান। ফেসবুকে দেয়া এক পোস্টে নরাধম ওই নেতা বলে, 'এখনই কুরআন পোড়ানোর উপযুক্ত সময়'। সেই সঙ্গে ঘোষণা দেয়, 'এবার তারা পবিত্র গ্রন্থের উপর 'শুকরের রক্ত' ঢালবে!' কী জিঘাংসা।

হালে ওই পাষণ্ডের দুষ্কর্মের ধারাবাহিকতায় ইরাকী বংশোদ্ভূত জনৈক নরাধম সালওয়ান মোমিকা গত ২৮ জুন ঈদ-উল-আযহার দিবসে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের কেন্দ্রীয় মসজিদের প্রাঙ্গণে কুরআন অগ্নিদগ্ধ করে ন্যাক্কারজনক নজির সৃষ্টি করেছে। এ লেখা ছাপবার দু'দিন আগে পুনর্বার কুরআন অগ্নিদগ্ধ করার দুষ্কর্ম সাধন করেছে এই পাষণ্ড বর্বর মোমিকা। সুইডেনের পর সভ্যতার ধ্বজাধারী রাষ্ট্র ডেনমার্কেও সম্প্রতি কুরআন পোড়ানোর মচ্ছব অনুষ্ঠিত হলো। ডেনমার্কের মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী উগ্রজাতীয়তাবাদী গ্রুপ দানস্ক প্যাট্রিয়ট পার্টি কোপেনহেগেনে ইরাকি দূতাবাসের সামনে পবিত্র কুরআন পুড়িয়ে তিন'শ কোটি তাওহীদবাদীদের মনে আঘাত হেনেছে।

পৃথিবীর সব ধর্ম গ্রন্থই নিজ নিজ অনুসারীদের কাছে অতি মর্যাদা ও সম্মানের বস্তু। তাই ধর্ম গ্রন্থ অবমাননা সব ধর্মেই নিন্দনীয় অপবাদ। বিশ্বের সব চেয়ে পঠিত ধর্ম গ্রন্থ আল কুরআন। ইসলাম ধর্মে কুরআন অবমাননা ও অমর্যাদা প্রদর্শন মারাত্মক অপরাধ। চরম সীমালঙ্ঘন।

পবিত্র কুরআন মুসলিম জাতির মর্যাদার চাবিকাঠি। কুরআনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা বহুগুণে মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) পবিত্র কুরআনের বার্তা বহন করেছেন। যদ্দরুণ আল্লাহ তাঁকে ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান করেছেন। নবী (ﷺ)-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তিনি পূর্ব ও পরের সব মানুষ এমনকি নবীদের নেতায় পরিণত হয়েছেন।

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর চিরসত্য বাণী। যারাই কুরআন অবমাননায় অংশ নিয়েছেন বা নিবেন তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগ ও ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ○ يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

অর্থ : "দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর। যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ অহংকারের সাথে অটল থাকে যেন সে তা শুনেনি। তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।"[২১]

সুপ্রিয় পাঠক! ইয়েমেনের গভর্নর জেনারেল আবরাহা সাবাহ হাবশী বায়তুল্লাহ ধ্বংস করতে যাওয়ার সময় আব্দুল মোত্তালিব বলেছিলেন, 'আমার উটগুলো ফেরৎ দিন, মহান আল্লাহর ঘর হেফাযতের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন।' অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদ আল্লাহর কিতাব। সংরক্ষণের দায়িত্ব তাঁর। এ প্রসঙ্গে বিঘোষিত হয়েছে–

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষনাবেক্ষন করবো।"[২২]

মনন বিকাশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অতি জরুরি। কিন্তু অপব্যবহার? মত প্রকাশের অপব্যবহার বন্ধ না করলে সমাজে-সমাজে, দেশে-দেশে হানাহানি ও অস্থিরতা বেড়ে যাবে। এমনি সতর্কবার্তা প্রতিফলিত হয়েছে বিশ্বের সবচাইতে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী রেতনো মাবসুদির কণ্ঠে। বিষয়টি বিশ্ব বিবেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। আশার কথা এই যে, কুরআন অবমাননার ঘটনায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউ এন এইচ আর সি) একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। 'বৈষম্য, শত্রুতা ও সহিংসতা উদ্রেককারী ধর্মীয় ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ' মর্মে প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়। প্রস্তাবের সপক্ষে ছিল বাংলাদেশ ভারতসহ আরো ২৮টি রাষ্ট্র। বিপক্ষে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ফ্রান্সসহ ১২ দেশ। ৭টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। দুঃখজনকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে। অথচ এ ধরনের ঘটনা ইসলাম বিদ্বেষ, ঘৃণাত্মক বক্তব্য আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইউএন এইচ আর সি প্রধান ভলকার টার্ক বলেছেন, 'মুসলিম বিদ্বেষ, ইসলাম বিদ্বেষ, ইয়াহূদী বিদ্বেষ কিংবা খ্রিষ্টানদের নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়'। আলোচনা, শিক্ষা এবং ধর্মীয় আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঘৃণা, তর্ক, মন্তব্য বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন টার্ক। আল কুরআনের বিষয় বস্তুত সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের অসাধারণ দলিল। পঙ্কিলতায় পূর্ণ তদানিন্তন আরব সমাজে তো কুরআনের প্রেসক্রিপসনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ক্ষমা ও সৌহার্দ্য-সম্প্রতির অশ্রুতপূর্ব সুরভিত নন্দন কাননে পরিণত হয়েছিল উষর জাজিরাতুল আরব। আজও যদি আমরা সম্মিলিতভাবে কুরআন বুঝে কুরআনের সম্মান করি, কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলি তবে অবশ্যম্ভাবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি কমবে। কমবে সামরিক ও নিরাপত্তা ব্যয়। পুনর্বার নিরাপদ হয়ে গড়ে উঠবে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি। ❑

[২১] সূরা আল জা-সিয়াহ্ :৭-৮।
[২২] সূরা আল হিজ্‌র : ৯।

আল কুরআনে একটি ঘটনা ও কিছু শিক্ষা

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী*

উবাই ইবনু কাব বলেন : একদা মূসা (আলাইহিস সালাম) বানী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী কে? মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জানামতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। তাই তিনি বললেন, আমিই বর্তমানে সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই কথাকে অপছন্দ করলেন। কারণ সে একথা বলেনি যে, মহান আল্লাহই ভালো জানেন কে অধিক জ্ঞানী? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! দুই সাগরের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমি তাঁর কাছে যেতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে ভ্রমণ শুরু করো। যেখানে পৌঁছে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তাঁর সন্ধান পাবে। মহান আল্লাহর কথা অনুযায়ী মূসা (আলাইহিস সালাম) থলের ভিতর একটি মাছ নিয়ে বের হলেন। সাথে ছিল ইউশা ইবনু নূন। পথিমধ্যে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে মূসা (আলাইহিস সালাম) ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলের ভিতর থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মুজিযা প্রকাশ পেল যে, মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল আল্লাহ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা ইবনু নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখছিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তখন ঘুমন্ত ছিলেন। জাগ্রত হলে ইউশা ইবনে নূন এই ঘটনা মূসাকে বলতে ভুলে গেলেন। তাঁরা সেখান থেকে পুনরায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন এক রাত সফর করার পর সকাল বেলা মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গীকে বললেন : আমার নাস্তা আনো। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যে স্থানে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আলাইহিস সালাম) ক্লান্তি বোধ করেননি। নাস্তা চাওয়ার পর ইউশা ইবনু নূন মাছের ঘটনা স্বরণ করলেন। তিনি বললেন, আমরা যে পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলাম, সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। আর আমি আপনাকে এই সংবাদটি দিতে ভুলে গিয়েছি। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল।

তখন তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রস্তর খণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, একজন লোক আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে সালাম দিলেন। খিযির (আলাইহিস সালাম) সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, এই জন মানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি মূসা। খিযির প্রশ্ন করলেন, বানী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, আমি বানী ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার সাথে এই শর্তে চলতে পারি, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।

খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আমি জানি না। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, ইন্‌শা-আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। কোনো কাজে আমি আপনার বিরোধিতা করব না। খিযির বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না যে পর্যন্ত না আমি নিজে তা আপনার কাছে ব্যক্ত করি।

এ কথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে থাকলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে। তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথা বললেন। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিলো। এসময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার কিনারায় বসল এবং সাগর থেকে এক ঠুকুর বা দুই ঠুকুর পানি পান করল। খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, এই পাখিটি বিশাল সাগর থেকে যে পরিমাণ পানি পান করেছে আমি এবং আপনি মহান আল্লাহর জ্ঞানের সমুদ্র থেকে ঠিক ততটুকু জ্ঞানই অর্জন করেছি। নৌকায় উঠেই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মূসা স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, তারা আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় তুলে নিয়েছে আর আপনি তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়। আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) যুক্তি পেশ করে

* *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি- কেন্দ্রীয় জমঈয়ত।*

বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ঠ হবেন না।

নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। আপনি নিঃসন্দেহে একটি অপছন্দনীয় কাজ করেছেন। খিযির বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দিবেন। আমার আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করেছিল। খিযির (আলাইহিস সালাম) এই গ্রামে একটি পুরাতন প্রাচীর দেখলেন, যা পতন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটিকে সোজা করে দিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, এখন শর্ত পূরণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদের সময়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মূসার উপর রহমত নাযিল করুন। আমাদের আকাঙ্খা ছিল, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করে আরো কিছু সময় থাকতে পারতেন, তাহলে তাদের আরও কিছু ঘটনা আমাদের কাছে বর্ণনা করা হত। তিনি বললেন : এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। নৌকাটির ব্যাপার, সেটি ছিল কয়েকজন মিসকীন ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। বালকটির ব্যাপার, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফ্‌র দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। অনুরূপ প্রাচীরের ব্যাপার সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা।

এই ঘটনা থেকে আমরা যে সমস্ত বিষয় শিখতে পারি তা হচ্ছে–

১) কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে বলা উচিত মহান আল্লাহই ভালো জানেন। অনুমান করে কথা বলা ঠিক নয়।

২) জ্ঞান অর্জনের জন্য ভ্রমণ করার ফযীলত জানা গেল। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) কষ্ট করে এই পথে দীর্ঘ সফর করেছেন।

৩) সফর অবস্থায় কিংবা বাড়িতে থাকা অবস্থায় প্রয়োজন পড়লে খেদমতের জন্য খাদেম সাথে রাখা জায়িয আছে। তবে শরিয়তসম্মত সীমা অতিক্রম করে খাদেমের কাছ থেকে যেন কোনো প্রকার খেদমত আদায় না করা হয়। ওযূর পানি এনে দেয়া, নাস্তা তৈরি করা ইত্যাদি কাজে খাদেমের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

৪) একজন মানুষ সব বিষয়ে জ্ঞানী হয় না; বরং একেকজন একেক বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন করেন। খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এমন এক প্রকার 'ইল্‌ম ছিল, যা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মধ্যে ছিল না। তাই হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসের কাছে, তাফসীরের বিষয়ে মুফাস্‌সিরের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত।

৫) ক্ষুধা লাগলে প্রকাশ্যে খাদ্য চাওয়া কোনো দোষের বিষয় নয়। খিযির ও মূসা (আলাইহিস সালাম) এক গ্রামবাসীর কাছে গিয়ে খাদ্য চাইলেন। এর আগে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর খাদেম ইউশা ইবনু নুনের কাছেও নাস্তা চেয়েছেন। তারা এটাকে লজ্জাষ্কর মনে করেননি।

৬) মূসা (আলাইহিস সালাম) খাদেমকে বললেন আমাদের নাস্তা নিয়ে এসো। সেখানে মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং ইউশা ইবনে নুন ছাড়া আর কেউ ছিল না। বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা থেকে বুঝা যায় তিনি খাদেমকে সাথে নিয়ে নাস্তা করতে চেয়েছিলেন। তাই খাবার গ্রহণ করার সময় নিজের খাদেমকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

৭) মূসা (আলাইহিস সালাম) জ্ঞান অর্জনের জন্য খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে গেলেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, ছাত্র শিক্ষকের কাছে যাবে। শিক্ষক ছাত্রের বাড়িতে যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনের কথা ভিন্ন। ইমাম বুখারী স্বীয় মসজিদে বসে বুখারীর দারস দিতেন। তার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বুখারার আমীর ইমাম বুখারীকে বললেন, আমার ছেলেদেরকে

বুখারী পড়াতে হবে। তবে আপনার মসজিদে নয় আমার রাজদরবারে এসে পড়াবেন। কারণ সাধারণ ছেলেদের সাথে আমার ছেলেরা আপনার মসজিদে পড়তে গেলে আমার সম্মানের ক্ষতি হবে। ইমাম বুখারী দেখলেন, তিনি যদি আমীরের ছেলেদেরকে পড়াতে রাজদরবারে যান, তাহলে রাসূলের হাদীসের সম্মান নষ্ট হয়। তাই তিনি আমীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এবার আমীর বললেন : তাহলে আপনার মসজিদেই আমার ছেলেদের জন্য আলাদা পাঠ দানের ব্যবস্থা করুন। ইমাম বুখারী এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন, এই ভেবে যে সাধারণ শিক্ষার্থীগণ এতে মনক্ষুণ্ন হবেন, এবং তারা কষ্ট পাবেন। এবার আমীর ক্ষেপে গিয়ে ইমাম বুখারীকে দেশ থেকে বের করে দিলেন। বের হওয়ার সময় ইমাম বুখারী আমীরের উপর বদ দু'আ করে বললেন : হে আল্লাহ! সে আমাকে যেভাবে বেইজ্জতি করল, তুমিও তাকে বেইজ্জতি করো। এর কিছু দিন পরই বুখারার জনগণ আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে রাজ্য হারা করে ফেলল।

৮) এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে 'ইল্‌ম দুই প্রকার। একটি হচ্ছে যা মানুষ পরিশ্রম করে অর্জন করতে পারে অন্যটি হচ্ছে 'ইল্‌মে লাদ্দুন্নী, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাউকে অনুগ্রহ করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি তাকে আমার পক্ষ হতে এক বিশেষ জ্ঞান দান করেছি।

৯) শিক্ষকের সাথে কথা বলার সময় আদব-কায়দা ঠিক রাখার কথা জানা যায়। মূসা (আলাইহিস সালাম) আদবের সাথে খিযির (আলাইহিস সালাম) কে বললেন : আমি কি এই শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন?[২৩] তিন ঐ সমস্ত লোকদের মতো আচরণ করেননি, যারা শিক্ষকের সামনে অহংকার ও তাকাব্বরী করে থাকে। সুতরাং শিক্ষার্থীর জন্য তার উস্তাযের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার অনুসরণ করা জরুরি।

১০) অধিক জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি তার তুলনায় কম শিক্ষিত ও কম মর্যাদাবান লোকদের থেকে জ্ঞানের কথা শিখতে বাঁধা নেই। কোনো সন্দেহ নেই যে মূসা (আলাইহিস সালাম) খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান ছিলেন।

১১) ভয়-ভীতি না থাকলে জীবিকা অর্জন, মহান আল্লাহর পথে জিহাদ, 'ইল্‌ম অর্জন অথবা অন্যান্য প্রয়োজনে সাগর পথে ভ্রমণ করা জায়িয আছে।

১২) শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের সামনে ধৈর্য ধারণ করবে, কথা কম বলবে, দেখবে, শুনবে আর অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। খিযির (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে লক্ষ্য করে বললেন : আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারেন না। যে বিষয় আপনার আয়ত্বাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?

১৩) এই ঘটনা থেকে খিযির (আলাইহিস সালাম) পানিতে থাকতেন কথাটি ভুল প্রমাণিত হলো। কথাটি মোটেই ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মূসা! দুই সাগররে মিলনস্থলে (ডাঙ্গায়) অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আরও জানা যায় যে, তাঁরা সাগরের কিনারা দিয়ে হাঁটছিলেন এবং নৌকার শ্রমিকরা তাদেরকে নৌকায় তুলে পার করে দিলেন। সুতরাং পানিতে থাকার কথা ভিত্তিহীন।

১৪) ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে ইন্‌শা-আল্লাহ বলতে হবে। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন : ইন্‌শা-আল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

১৫) বিশেষ প্রয়োজনে নিজের কিংবা অন্যের সম্পদ হিফাযত করার জন্য সামান্য সম্পদ নষ্ট করা দোষের নয়। অন্যের অনুমতি ব্যতীতও তা করা যেতে পারে। তাই খিযির (আলাইহিস সালাম) যখন দেখলেন, বাদশাহ বা বাদশার লোকেরা নৌকাটি ছিনতাই করে নিয়ে যেতে পারে, তাই নৌকাটি ছিদ্র করে ফেললেন। কারণ সেখানকার বাদশাহর অভ্যাস ছিল কেবল ভালো নৌকাগুলোই নিয়ে যেত; ত্রুটিযুক্তগুলো নয়।

১৬) দাঈ'গণ কখনও অন্যায় কাজ দেখে চুপ থাকবেন না। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে তার প্রতিবাদ করবেন। খিযির (আলাইহিস সালাম) এমন তিনটি কাজ করলেন, যা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। তাই তিনি কাজগুলোর প্রতিবাদ করেছেন।

১৭) এখান থেকে আরও শিক্ষা নেওয়া যায় যে, উস্তায যদি ভুল করেন তাহলে নীতিমালা বজায় রেখে ছাত্র তার প্রতিবাদ করতে পারবে।

১৮) ছাত্র ভুল বশত কিছু করে ফেললে তাকে ক্ষমা করে দেয়া মহৎ গুণ। সুতরাং যতদূর সম্ভব মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া উচিত, তাদের উপর সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়।

১৯) দুই বন্ধু এক সাথে চলা এবং অন্যান্য বিষয়ে চুক্তি বদ্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, বন্ধুর অন্যায় কাজগুলো দেখেও চুপ থাকতে হবে এবং তার প্রতিবাদ করা যাবে না। কেননা

[২৩] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৬৬।*

খিযির এবং মূসা (আলাইহিস সালাম) চুক্তি বদ্ধ হলেন যে, খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর কোনো কাজেই মূসা (আলাইহিস সালাম) আপত্তি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই নৌকা ছিদ্র করার সময় মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রতিবাদ করলেন।

২০) সবসময় বাহ্যিক অবস্থা দেখে ফলাফল নির্ধারণ করা ঠিক নয়। মূসা (আলাইহিস সালাম) দেখলেন খিযির (আলাইহিস সালাম) তিনটি বড় ধরনের অপরাধ করেছেন। কিন্তু তিনি ভালোর জন্যই তা করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার কতিপয় মুসলমান মনে করলেন যে, তাদেরকে চিরদিনই কাফিরদের নির্যাতন সহ্য করতে হবে। কিন্তু এই নির্যাতনের পরই যে মহান আল্লাহর সাহায্য আসবে, তা অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট ছিল না। বাস্তবে অল্প কিছু দিন পরই মুসলিমগণ বিজয় লাভ করলেন এবং পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন।

২১) এই ঘটনা থেকে শরিয়ত ও মারেফতের দোহাই দিয়ে কথিত ওলীদের অন্যায় কাজ করার পক্ষে দলিল গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কারণ খিযির (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর অনুমতিতেই কাজগুলো করেছেন। ওয়াহীর মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারলাম।

২২) পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ছোট ক্ষতিতে লিপ্ত হওয়া জায়িয আছে। ছেলেটিকে হত্যা করা এবং নৌকা ছিদ্র করা অন্যায় ছিল। কিন্তু ছেলেটি জীবিত থেকে সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে কুফ্‌রীর মতো জঘন্য ফিতনার দিকে নিয়ে যাওয়া হত্যার চেয়ে আরও ভয়াবহ ক্ষতির কারণ। তাই বড় ফিতনা থেকে পিতা-মাতাকে বাঁচানোর জন্য ছেলেটিকে হত্যা করা হয়েছে।

২৩) বাহ্যিক দিকে খেয়াল করেই দুনিয়াতে হত্যা, লুটতরাজ, ব্যভিচার ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর হুকুম লাগানো হবে। কেননা মূসা (আলাইহিস সালাম) খিযির (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক একটি শিশুকে খুন করতে দেখে এবং নৌকাটি ছিদ্র করতে দেখে বিলম্ব না করে সাথে সাথেই প্রতিবাদ করেছেন।

২৪) এই ঘটনা থেকে মিসকীনের সংজ্ঞা এবং ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তার সংসার চলে না তাকে মিসকীন বলা হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে মিসকীনদের একটি নৌকা ছিল, যা দিয়ে তারা সাগরে কাজ করত। আর যার কিছুই নেই তাকে ফকীর বলা হয়।

২৫) বিনা অপরাধে মানুষ হত্যা করা কবীরা গুনাহ।

২৬) খিযির (আলাইহিস সালাম) ইয়াতীম ছেলেদের প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দীনের দাঈ ও আলেমদের উচিত প্রয়োজনবশতঃ বিনা মজুরীতে অসহায় মানুষের সেবা করা।

২৭) এ ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইয়াতীমদের সেবা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে আলেম ও সৎ লোকগণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান রেখে মারা গেলে তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের প্রতি আরও বেশি খেয়াল রাখা দরকার। খিযির (আলাইহিস সালাম) যে ইয়াতীম ছেলেদের প্রাচীর ঠিক করে দিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾

অর্থাৎ- "তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎ লোক।"[২৪]

২৮) ভালো মানুষের খেদমত করা অন্যান্য মানুষের খেদমত করার চেয়ে উত্তম। সম্ভবতঃ খিযির (আলাইহিস সালাম) লোকটি সৎ হওয়ার কারণেই তার ছেলেদের প্রাচীর ঠিক করে দিয়ে ছিলেন। ঐ দিকে আবার নৌকার শ্রমিকরাও খিযির (আলাইহিস সালাম)-কে চিনতে পেরে বিনা পয়সাতেই পার করে দিলেন। অথচ তারা অন্যদের বেলায় তা করতেন বলে মনে হয় না।

২৯) সৎ কাজ করে তা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা এবং তা নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়; বরং তা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে হয়েছে বলে প্রকাশ করা এবং মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কেননা খিযির (আলাইহিস সালাম) প্রাচীর ঠিক করার পর বললেন, আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পন করুক এবং তাদের গুপ্ত ধন উদ্ধার করুক।

৩০) অপর পক্ষে নৌকা ছিদ্র করার পর বললেন : আমি ইচ্ছা করলাম যে এটি ত্রুটিযুক্ত করে দেই। সুতরাং ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে নিজের দিকে এবং শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত করা উচিত।

৩১) এখান থেকে ওয়াদা রক্ষা করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। কেননা মূসা (আলাইহিস সালাম) খিযির (আলাইহিস সালাম)এর সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

৩২) কোনো ব্যাপারেই তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। রাসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসার উপর রহম করুন। তিনি যদি খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে আরও কিছুক্ষণ সবর করতেন, তাহলে আমরা তাদের আরও অনেক খবর জানতে পারতাম। *[২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[২৪] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ৮২।*

গোপন পাপকর্ম জনসম্মুখে প্রকাশ : পরিণতি ভয়াবহ

গ্রন্থনায় : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল*

মহাশক্তিধর আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে তাদের পাপাচারের ফলে কী ভয়ানক শাস্তি দিয়েছেন তার চিত্র ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾

“আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝড়, কাউকে আঘাত করেছে বজ্র নিনাদ, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি পানিতে নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো অবিচার করেননি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার (পাপাচার) করেছিল।”[২৫]

আর পাপকাজ যখন প্রকাশ্যে করা হয় বা গোপনে সংঘটিত পাপাচার জনসমাজে প্রকাশ করা হয় তখন তা মহান আল্লাহর নিকট পাপ করার চেয়েও বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। তিনি এটিকে ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা মোটেও পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا﴾

“আল্লাহ কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুল্‌ম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।”[২৬]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : "كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلَ : يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, “আমার সকল উম্মত ক্ষমা পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয়ই পাপাচার প্রকাশের একটি দিক হলো, কোনও ব্যক্তি রাতে অপরাধ করলো যা আল্লাহ তা‘আলা গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগলো, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলো যে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপকর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর মহান আল্লাহর পর্দা খুলে ফেলল।[২৭]

পাপের প্রকাশ তিনভাবে ঘটে থাকে। যথা-

১) কোনো অন্যায়-পাপকর্ম গোপনে করা। যা সে ছাড়া আর কেউ জানত না। পরে তা তার বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী ও সঙ্গী-সাথীদের নিকট প্রকাশ করা বা গর্বের সাথে বলা অথবা বিভিন্ন মিডিয়া যেমন- এফএম রেডিও, ইউটিউব, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা।

বর্তমানে এফএম রেডিওতে ‘জীবনের গল্প’ জাতীয় অনুষ্ঠানে কিছু অর্বাচীন যুবক তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা পাপাচার, অশ্লীলতা ও নোংরামির দিকগুলো খুব রঙ-রস মাখিয়ে গর্বের সাথে উপস্থাপন করে। আবার সেগুলো ইউটিউব ও ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার করা হয়! আফসোস এসব নির্বোধ যুবকদের জন্য!। তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট হিদায়েত কামনা করছি।

২) পাপাচার করে অনুরূপ পাপাচারকারীদের সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করা।

৩) প্রকাশ্যেই পাপাচার ও অন্যায়-অপকর্ম করা। আমাদের সমাজে এর উদাহরণের অভাব নেই।

* দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব।
[২৫] সূরা আল ‘আনকাবূত : ৪০।
[২৬] সূরা আন্ নিসা : ১৪৮।
[২৭] সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিম।

নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাপাচারের উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

⊙ প্রকাশ্যে ধূমপান করা। ⊙ দাড়ি মুণ্ডন করা বা ছোটো করা। ⊙ পুরুষদের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে এবং মহিলাদের টাখনুর উপরে উঠিয়ে কাপড় পরা। ⊙ নারীদের পর্দাহীনতা ও সুগন্ধি মেখে বাইরে চলাফেরা করা। ⊙ উচ্চ আওয়াজে গান-বাজনা করা, শোনা বা বিভিন্ন কনসার্টে অংশগ্রহণ করা। ⊙ নাটক, সিনেমা, পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকা। ⊙ স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসায় সহশিক্ষা এবং অফিস, আদালত ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। ⊙ সুদি ব্যাংক ও সুদি কারবারের সাথে জড়িত হওয়া। ⊙ তথাকথিত থার্টি ফাস্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন ডেই ইত্যাদি উদযাপন করা। ⊙ বিভিন্ন বার, নাইট ক্লাব, পার্ক ইত্যাদিতে প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের নোংরামি। ⊙ প্রকাশ্যে শির্‌ক, বিদআত ও নানা ধরনের অপসংস্কৃতি চর্চা... ইত্যাদি। এগুলো সব প্রকাশ্য পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন –আমীন।

প্রকাশ্য পাপাচার এবং গোপন পাপকর্ম জনসম্মুখে প্রকাশ করার ভয়াবহ পরিণতি :

১) পাপাচার নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা করা অথবা প্রকাশ্যে পাপ ও অন্যায় করার ফলে সমাজে অশ্লীলতা, নোংরামি ও অন্যায়-অপকর্মের বিস্তার ঘটে। কেননা এর ফলে দুর্বল ঈমান ও রুগ্‌ণ হৃদয়ের মানুষেরা পাপাচার করাকে সহজ ভাবতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে দুনিয়া ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[২৮]

যারা কেবল অশ্লীলতার প্রসার লাভ করাকে পছন্দ করে তাদের জন্য যদি এই শাস্তির হুমকি হয়, তাহলে যারা তা প্রচারে লিপ্ত তাদের কী পরিণতি হবে তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তা'আলা তুমি ক্ষমা করো –আমীন।

২) এটি আল্লাহ, রাসূল এবং সৎকর্মশীল ঈমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার শামিল। যেমন- ইবনু বাত্তাল বলেন :

في الجهرِ بالمعصية استخفافٌ بحقِّ الله ورسوله، وبصالحي المؤمنين، وفيه ضَرْبٌ مِن العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف.

"পাপাচার প্রকাশ করার মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের অধিকারকে এবং নেককার ও সৎলোকদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এটা এক প্রকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন। অথচ তা গোপন রাখা হলে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে রক্ষা পেত।"

৩) যে ব্যক্তি উক্ত পাপাচার সম্পর্কে জানত না তাকে পাপের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং যত মানুষ তার দেখানো পথে চলে অন্যায়ে জড়িত হবে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সমপরিমাণ গুনাহ তার 'আমলনামায় জমা হতে থাকবে। রাসূল (ﷺ) বলেন :

مَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئَة فعَلَيْهِ مِثْل وِزْر كُلّ مَنْ عمل بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

"যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ (মহান আল্লাহর নাফরমানী, পাপ, অন্যায়-অপকর্ম, বিদআত ইত্যাদি) চালু করলো কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সে কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহ তার উপর পতিত হতে থাকবে।"[২৯]

৪) যে সমাজে যিনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও মহান আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজ ছড়িয়ে পড়লে নানা রোগ-ব্যাধি ও মহান আল্লাহর 'আযাবের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوْا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ

---

[২৮] *সূরা আন্ নূর : ১৯।*

[২৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৯১।*

وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ إِلَّا جعَلَ اللهُ بأْسَهم بينهم.

"'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করে বললেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা (পাঁচটি কাজ করলে) পাঁচটি বিপদের সম্মুখীন হবে। (আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও।) **ক.** যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। **খ.** যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, জিনিসপত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি এবং শাসকদের পক্ষ থেকে জুলুম-নির্যাতন। **গ.** যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। **ঘ.** যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন। তখন তারা তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। **ঙ.** যখন তাদের শাসকবর্গ মহান আল্লাহর কিতাব মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করে না এবং মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।"[৩০]

৫) ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি : 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتْ الْخُمُوْرُ.

এই উম্মতের মাঝে দেখা দেবে ভূমিধস, আকার-আকৃতির বিকৃতি সাধন এবং আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি। তখন মুসলিমদের মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কখন হবে? তিনি বললেন : যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ ঘটবে এবং মদপান করা হবে।[৩১]

অন্য বর্ণনায় আছে– وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ "যখন রেশমি কাপড় পরিধান করা হবে।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে– إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ "যখন অশ্লীলতা, নোংরামি ও বদ চরিত্র ইত্যাদি প্রকাশ পাবে।"

৬) প্রকাশ্য পাপাচার শুরু হলে সমাজ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা বিদায় নেয়, চতুর্দিকে হাহাকার, বরকত শূন্যতা দেখা যায়।

৭) প্রকাশ্যে ও নির্ভয়ে মহান আল্লাহর নাফরমানি ও পাপাচার নিয়ে আলোচনা করা মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের মনোভাব হালকা করে দেয়।

৮) একজন মানুষ পাপ করার পরে মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মানুষের নিকট প্রকাশ করা হলে তারা কখনোই তা ভুলে না। এই কথাটি তারা সুযোগ পেলে পরবর্তীতে ওই ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে মারে এবং তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

৯) বিশেষ করে এফএম রেডিওর মাধ্যমে এসব নোংরা ও পাপাচার প্রচারের ফলে একসাথে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাল পরিক্রমায় অগণিত মানুষকে এই অন্যায়ের সাক্ষী বানিয়ে দেওয়া হয়।

১০) গোপনে অন্যায় অপকর্ম করার পর তা প্রকাশ করা হলে এতে দু'দিক থেকে গুনাহ হয়। যথা- **ক.** পাপাচার ও অন্যায় অপকর্ম করার গুনাহ, **খ.** সেগুলো প্রকাশ করার গুনাহ (যেমনটি আমরা উপরের হাদীস থেকে জেনেছি)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার আল্লাহর নাফরমানি থেকে হিফাযত করুন এবং আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন –আমীন। ❑

[৩০] *সুনান ইবনু মাজাহ্- অধ্যায় : ৩০/কলহ-বিপর্যয়, পরিচ্ছেদ : ৩০/২২. অপরাধের শাস্তি, হা. ৪০১৯।*

[৩১] *আত্ তিরমিযী- হা. ২১৩৮, আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।*

ইন্‌শা-আল্লাহ না বলার কুফল

–ডা. সুলতান আহমদ*

বর্তমান সমাজে কখন "আলহামদুলিল্লাহ" বলতে হয় এবং কোন সময় "ইন্‌শা-আল্লাহ" বলতে হয়, অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয়। কোনো কাজ শেষে "আলহামদুলিল্লাহ" এবং ভবিষ্যতে করবো তখন "ইন্‌শা-আল্লাহ" বলব। তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলা রহমত ও বরকত দান করবেন। ভবিষ্যতে সকল কাজ করতে তিনি সাহায্য দান করবেন।

এক ব্যক্তি এসে মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ) কাছে একটা বিষয়ে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন যে, অমুকদিন এসো, তোমাকে জানিয়ে দেয়া হবে। লোকটি পরপর তিনবার এসে জানতে চাইলেন। কিন্তু মহানবী (ﷺ) নীরব। লোকটি বিষণ্ন হয়ে ফিরে গেলেন। মহানবী আল্লাহ তা'আলার দরজায় সিজদায় নত হলেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর কাছে মাপ চাইলেন। জিবরাঈল (আঃ) মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, তিনি লোকটির সাথে কথা বলার সময় "ইনশা-আল্লাহ" না বলাতে ওয়াহী নাযিল বন্ধ হয়ে যায়। পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেন এবং ওয়াহী নাযিল করে লোকটিকে ফায়সালা জানিয়ে দেন। সুলায়মান (আঃ)-এর জীবদ্দশায় "ইন্‌শা-আল্লাহ" না বলাতে ফলাফল শূন্য পেয়েছেন। তাঁর মনের আশা শতভাগ ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে আমরা যদি সচেতনতার সাথে ভবিষ্যৎ সকল কথা ও কাজকে সম্পাদনের সময় "ইন্‌শা-আল্লাহ" না বলি তা হলে কাজতো হবেই না, আর হলেও বরকত আসবে না। মহান আল্লাহর অকল্যাণে সব কিছু আচ্ছাদিত হবে।

সহীহ মুসলিমর ৪১৩৯, ৪১৪০ ও ৪১৪১ পৃষ্ঠাত্রয়ে দেখা যায় যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর ষাটজন সহধর্মিণী ছিল। এক সময় তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি অদ্য রজনীতে সকল স্ত্রীর কাছেই মহান করবো অর্থাৎ- সহবাস করবো। অতএব, প্রত্যেকেই গর্ভবতী হবে এবং প্রত্যেকেই এমনসব সন্তান প্রসব করবে যারা মহান আল্লাহর পথে অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করবে। কিন্তু পরিশেষে একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউই গর্ভবতী হননি। এরপর তিনি অর্ধমানবাকৃতির একটি সন্তান প্রসব করলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যদি তিনি "ইন্‌শা-আল্লাহ" বলতেন, তবে নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকেই এমনসব সন্তান প্রসব করতেন, যারা প্রত্যেকেই অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতেন।

৪১৪৩ নং হাদীসে জানা যায় যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একসময় সুলায়মান ইবনু দাঊদ (আঃ) বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি অদ্য রজনীতে নব্বইজন স্ত্রীর প্রত্যেকের কাছেই যাবো। এতে তারা অশ্বারোহী সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এমনসব সন্তান প্রসব করবে যারা ভবিষ্যতে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তখন তার সাথী তাঁকে বললেন, আপনি ইন্‌শা-আল্লাহ বলুন। কিন্তু তিনি "ইন্‌শা-আল্লাহ" বলেননি। এরপর তিনি সকল স্ত্রীর সাথেই সহবাস করলেন। কিন্তু মাত্র একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কোনো স্ত্রী গর্ভবতী হলেন না। তিনি যে সন্তানটি প্রসব করলেন তাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। সেই মহান সত্তার শপথ। যার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবন, যদি তিনি তখন "ইন্‌শা-আল্লাহ" বলতেন, তারা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করতো।

শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে–

১. আমাদের কোনো কিছু করার এখতিয়ার নেই।
২. আল্লাহতা'আলার নির্দেশ ছাড়া কোনোকিছুই হয় না।
৩. যা কিছু করবো, মহান আল্লাহর উপর ভরশা রেখেই করবো।
৪. ভবিষ্যৎ সকল কথায় ও কাজে "ইনশা-আল্লাহ" বলবো।
৫. আল্লাহর নাফরমানি বান্দা-বান্দী হবো না। ❑

* *উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন। সদস্য সচিব, আহবায়ক কমিটি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখা।*

বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ

–মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

[প্রথম পর্ব]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার ২৩ বৎসরের নবুওয়াতী জীবনে বহু মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন। ইসলামের পথে দাওয়াত হতে শুরু করে মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত তার বক্তৃতার পরিধি বিস্তৃত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি যোদ্ধাদের সম্মুখে বক্তব্য প্রদান করেন। অধিকাংশ বক্তৃতা মসজিদ কেন্দ্রিক হলেও মাঠে-ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতার সংখ্যাও কম নয়। মসজিদ যেহেতু সেই সময় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাই সঙ্গত কারণে বৈদেশিক দূতদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ, ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ও যুদ্ধে গমনকারী সেনানায়কদের এবং নিয়োগপ্রাপ্ত স্বীয় রাষ্ট্রদূতদের সম্মুখে মসজিদে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা দিতেন। মিম্বার ও অনুচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে অথবা উট ও ঘোড়ার উপর বসে জনগণের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান করতেন। পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে তার বক্তৃতা কখনও দীর্ঘ বা কখনও স্বল্পস্থায়ী হতো। আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ)-এর উপর ঈমানে পার্থিব জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তি নিহিত। এক কথায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা প্রদান করেননি।

ওয়াজ, বক্তৃতা, আলোচনা ও ভাষণকে আরবী ভাষায় খুতবা বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে জনগণের সম্মুখে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনামূলক যেই ভাষণ প্রদান করা হয় তাই খুতবা। খুতবা প্রদানকারী খতীব (বক্তা) নামে পরিচিত। খুতবা-এর ইংরেজী পরিভাষা হচ্ছে Sermon discourse।[৩২]

খতীব (বক্তা) হিসেবে কেমন ছিলেন রাসূল (ﷺ)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরবের এমন এক ঐতিহাসিক স্থানে আবির্ভূত হন যার অধিবাসী প্রকৃতিগতভাবে সব দক্ষতা ও কর্মশক্তি তাদের নিজস্ব ভাষা আরবির চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় করেছে। আরবের জনগোষ্ঠীর উপর এই ভাষার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। আরবি ভাষা তার কাব্যিক শৈলীর কাছে ঋণী এবং ইতঃপূর্বে আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা এত ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়নি। প্রাক-ইসলামী যুগে ভাষণদক্ষ ব্যক্তি আরবে অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন হতেন। আরবগণ প্রকৃতিগতভাবে বাকপটু, সরলভাষী এবং বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ভাষণ দক্ষতা ছিল যেন তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য।

আল্লামা জাহিজ তাই যথার্থই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন এক জাতির কাছে প্রেরিত হন যাদের সুনামের বিশিষ্টতা হলো বাকপটুতা ও বাগ্মিতা। নিঃসন্দেহে আরবগণ বাকপটুতা, উপস্থাপনা, শব্দালংকার ও বাগ্মিতার জন্য গৌরববোধ করতেন। দৈবাৎ সমাজে যদি কোনো ব্যক্তি এইগুলো হতে বঞ্চিত হতেন তিনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান হতেন না।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশোদ্ভূত এবং প্রতিপালিত হয়েছিলেন বানূ সা'দ গোত্রে। ফাসাহাত ও বালাগাতে এই দুই বংশ ছিল সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাদের ভাষা সকলের জন্য নমুনাস্বরূপ ছিল। কুরায়শদের ভাষাকেই আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ বর্ণনারূপে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ○ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ○ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾

"নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ। জিব্‌রাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।"[৩৪]

আরবের ভাষাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষার বিশুদ্ধতা ও সাহিত্যালংকরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং আল-কুরআনের পর তারই ভাষাকে আরবি সাহিত্যেও বিশুদ্ধতম ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৩৫]

মহানবী (ﷺ)-এর ভাষাশৈলী ফাসাহাত ও বালাগাত এবং অনবদ্য বর্ণনা-রীতি ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। তাই তা ওয়াহয়ির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।[৩৬]

---

[৩২] *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ- পৃ. ৩৭১; Standerd Twentieth Century Dictionary, p-288।*

[৩৩] *আল বায়ান ওয়াত্ তাবঈন- ২/২৪ পৃ.।*

[৩৪] *সূরা আশ্ শু'আরা- ১৯২-১৯৫।*

[৩৫] *ইহসানুন-নাসর, আল-খিতবাতুল-আরাবিয়্যাহ, ৪৮ পৃ.।*

[৩৬] *তারীখুল-আদাবিল-আরাবী- ১৮ পৃ.।*

তিনি সাবলীল ভাষায় অতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের মনোজ্ঞ করে তুলতেন। প্রয়োজন হলে তিনি বক্তব্য বিশদ বর্ণনা করতেন, অন্যথায় সুস্পষ্টভাবে অল্প কথায় বক্তব্যে প্রকাশ করতেন। তার বক্তব্য কখনও অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হত না এবং তিনি অমার্জিত শব্দও প্রয়োগ করতেন না। কথা বললে মনে হত যেন জ্ঞানের প্রস্রবণ উৎসারিত হচ্ছে। তার বাকধারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যধন্য ছিল। তার অনন্য সাধারণ অমর বাণী হতে প্রতীয়মান হয়, তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় ও সমাদৃত ছিলেন। এতে যেমন ছিল ভাবগাম্ভীর্য, তেমনি ছিল মাধুর্য। শব্দ কম হত, অথচ মর্ম সহজ ও সর্বজনবোধগম্য। তার কথা এত স্পষ্ট ও সাধারণের পক্ষে বোধগম্য হত যে, তা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হত না। তথাপি যদি কেউ পুনরাবৃত্তির আবেদন জানাত, তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। তার কথায় কখনও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হত না। তার বক্তব্য হত যুক্তিপূর্ণ ও প্রমাণসিদ্ধ। যুক্তিতর্কে কেউ কখনও তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় নাই। তার দীর্ঘ ভাষণের বাক্য সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত হত। তিনি সত্য ও সঠিক তথ্যপূর্ণ কথাই বলতেন। শব্দের মারপ্যাঁচ এবং অপরের ছিদ্রান্বেষণ হতে সর্বদাই বিরত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত শ্লথভাবে কিংবা দ্রুতভাবে তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না। তিনি অহেতুক কথা দীর্ঘ করতেন না এবং কখনও সুস্পষ্ট ভাষায় ভাব প্রকাশে অসমর্থ হতেন না। পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে জনগণের জন্য কল্যাণকর ও মহোত্তম আদর্শ ও লক্ষ্য সংবলিত বক্তব্য উপস্থাপনায় তার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বাগ্মী পরিলক্ষিত হয় না। তার বাণীসমূহ ছিল প্রেরণাদায়ক ও প্রভাব বিস্তারকারী। বর্ণনাধারা ছিল সহজ, মনোজ্ঞ; ভাষণ বিশুদ্ধ শব্দ সম্বলিত এবং উদ্দেশ্য মহান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগের কবি-সাহিত্যিক ও বাগ্মীগণ প্রায়শই বলতেন, তিনি যদি অন্য কোনও গুণে বিভূষিত নাও হতেন, তবুও তাৎক্ষণিক তার ভাষণের উচ্চতম মানের ভাষা সৌকর্য, ফাসাহাত ও বালাগাতের মুজিযাই তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট ছিল।[৩৭]

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সাহিত্যালংকারে সমৃদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধভাষী কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন– রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।[৩৮]

রাসূল (ﷺ) কিভাবে বক্তৃতা শুরু করতেন

রাসূল (ﷺ) হামদ ও সানা, ইসতিগফার (অনুশোচনা) ও মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) জ্ঞাপক বাক্য দ্বারাই সর্বদা বক্তব্যের সূচনা করতেন। শুধুমাত্র দুই ঈদের খুতবায়ই তিনি তাকবীর (আল্লাহ আকবর) দ্বারা আরম্ভ করতেন। অধিকাংশ বক্তৃতায় তিনি আল্লাহ-ভীতির উপদেশ দিতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের ভাষণে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। যেই সকল ভাষণে তাওহীদের শিক্ষা থাকত কিংবা জাহান্নাম হতে সতর্ক করা যার উদ্দেশ্য হত, সেসব বক্তৃতা অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত হত।[৩৯]

বক্তৃতার সময় রাসূল (ﷺ)-এর শারীরিক অবস্থা

রাসূল (ﷺ) যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তার চক্ষু রক্তিম হয়ে যেত, শব্দ গুরুগম্ভীর ও বলিষ্ঠ হত। মুখমন্ডলে মাহাত্ম্য ফুটে উঠত, আবেগের প্রবলতায় হাতের আঙ্গুলসমূহ উত্তোলিত হতে থাকত এবং মনে হত, যেন তিনি ইসলামী সেনাদলকে জিহাদের জন্য হাতের ইশারায় উদ্বুদ্ধ করছেন। পবিত্র দেহ আন্দোলিত হত, হাত সঞ্চলনের সময় গ্রন্থি মটকানোর শব্দ শুনা যেত, বক্তৃতার মাঝে মাঝে নিজের হাত কখনও মুষ্টিবদ্ধ করতেন আবার কখনও তা খুলে ফেলতেন।[৪০]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি ভাষণে বাগ্মীসুলভ উদ্দীপনার চিত্রাংকন করতে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, মহা প্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তা আসমান-যমীনকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন– এই কথা বলে তিনি স্বীয় হাত মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং কখনও খুলে দিতেন। আমি দেখলাম, তিনি একবার ডানদিকে ঝুঁকতেছেন, আর একবার বামদিকে ঝুঁকতেছেন। এমনকি তার মিম্বরও এই কারণে আন্দোলিত হচ্ছিল। এই অবস্থা দেখে আমার আশংকা হচ্ছিল যে, মিম্বরটি যেন উল্টে না যায়।[৪১]

রাসূল (ﷺ) মানুষের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা দিতেন

কথা বলার ক্ষেত্রে মানুষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলা উচিত। দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা সমীচীন নয়। কারণ এতে মানুষ কথা বুঝতে না পেরে কষ্ট পায়।

وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ.

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'মানুষের নিকট সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পছন্দ করো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক?[৪২]

---

[৩৭] *ইবনু কুতায়বাহ্, উয়ূনুল-আখবার- ১/৪২৪ পৃ.।*
[৩৮] *আল-বায়ান ওয়াত তাবঈন- ১/৩১৪ পৃ.।*
[৩৯] *আব্দুল কারীম, আল-ইনসানুল-কামিল- পৃ. ১৩১।*
[৪০] *ইবনুল কায়্যিম, যাদুল-মা'আদ- ১/৪৮ পৃ.।*
[৪১] *সীরাতুন নবী- আল্লামা শিবলী নোমানী, ২/২৩৩ পৃ.।*
[৪২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৭।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষণরীতি ছিল সহজ, জটিল শব্দালংকার বর্জিত ও কষ্টকল্পিত উপমাবিহীন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষণে দীর্ঘ ভূমিকা থাকত না। বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ দ্ব্যর্থহীন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন, যাতে এইসব তাদের মনে চিরসজীব থাকে। কারণ সর্বোৎকৃষ্ট বাক্যরীতি তাই যা সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ।

মূল বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্রেকে তার পদ্ধতি ছিল প্রত্যক্ষ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষা ছিল সরল ও সাবলীল, দ্ব্যর্থহীন ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত, যা শ্রেষ্ঠ ভাষণের আরবীয় নমুনা।

বক্তৃতা উত্তম বিষয়ে হওয়া উচিত

মানুষের উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা মহান আল্লাহর দরবারে সংরক্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।"[৪৩]

তাই সদা উত্তম কথা বলা এবং কারো সাথে কথাবার্তা উত্তম বিষয়ে হওয়া উচিত। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[৪৪]

তিনি আরো বলেন–

اَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ এক টুকরো খেজুর দান করেও যদি হয়। আর তাও যদি না পার, তবে একটি মিষ্টি কথার বিনিময়ে হলেও (কেননা তাও দান সাদাক্বাহ্ সমতুল্য)।[৪৫]

কেননা মানুষ কথার কারণে পরকালে পাকড়াও হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

'মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[৪৬]

রাসূল (ﷺ) এমন বক্তৃতা দিতেন যাতে মানুষের অন্তর বিগলিত হতো

রাসূল (ﷺ)-এর বক্তৃতা শুনে মানুষের অন্তরগুলো বিগলিত হতো, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতো।

قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا : أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيْهِ ﴿وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ...﴾ (التوبة : ٩٢) فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا : أَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

আব্দুর রহমান ইবনু 'আম্‌র আস-সুলামী ও হুজর ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমরা আল-ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট আসলাম। যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত :

﴿وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ﴾

"আর তাদের উপরও কোনো দোষ নেই, যারা তোমার কাছে আসে, যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার। তুমি বললে, 'আমি তোমাদেরকে বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দুঃখে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা তারা ব্যয় করবে'।"[৪৭]

---

[৪৩] *সূরা ক্বা-ফ : ১৮।*
[৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৮-১৯; সহীহ মুসলিম- ৪৭।*
[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০২৩।*
[৪৬] *আত্ তিরমিযী- হা. ২৬১৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৭৩।*
[৪৭] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৯২।*

আমরা সালাম দিয়ে বললাম, আমরা আপনাকে দেখতে, আপনার অসুস্থতার খবর নিতে এবং আপনার কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে এসেছি। আল-ইরবাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো।

তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন কারো বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদআত এবং প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা।[৪৮]

রাসূল (ﷺ) বক্তৃতায় গুরুত্বপূর্ণ কথাকে তিনবার বলতেন

বক্তৃতায় সাধারণত তিনি সহজ-সরল বাক্য ব্যবহার করতেন। যদি তিনি কখনও কোনো বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করতে চাইতেন তখন প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন।

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) যখন কোনো কথা বলতেন তখন তা বুঝে নেয়ার জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোনো গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন।[৪৯]

রাসূল (ﷺ) সুমধুর কণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন

বক্তৃতায় শ্রুতিমধুর কণ্ঠের গুরুত্ব যথেষ্ট। আম্বিয়া-ই কিরাম (আলাইহিমুস সালাম)-এর মধ্যে দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে ফাসলুল-খিতাব (মীমাংসাকারী বচন) বলা হয়েছে। তাকে সুমধুর কণ্ঠসর আল্লাহ তা'আলার দান করেছিলেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾

"আর আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমাত ও কথাবার্তায় উত্তম সিদ্ধান্তদানের যোগ্যতা।"[৫০]

অর্থাৎ- আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুওয়াত। ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾-এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। দাউদ (আলাইহিস সালাম) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর **اما بعد** শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। তার বক্তব্য জটিল ও অস্পষ্ট হতো না। সমগ্র ভাষণ শোনার পর শ্রোতা একথা বলতে পারতো না যে তিনি কি বলতে চান তা বোধগম্য নয়; বরং তিনি যে বিষয়ে কথা বলতেন তার সমস্ত মূল কথাগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরতেন এবং আসল সিদ্ধান্ত প্রত্যাশী বিষয়টি যথাযথভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে তার দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে দিতেন। কোনো ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বিচার-বিবেচনা ও বাকচাতুর্যের উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থান না করলে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দের মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে।[৫১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কণ্ঠস্বর যেমন ছিল মধুর, তেমন উদাত্ত। ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সুন্দর দেহাবয়বের সাথে সুন্দর কণ্ঠস্বরও দান করা হয়েছিল।[৫২]

তাঁর কণ্ঠস্বর এত দূরে পৌঁছাত, যতদূরে আর কারও পৌঁছাত না। তিনি মিনাতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, লোকেরা তা অনেক দূর-দূরান্ত হতে শুনতে পেয়েছিল। উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে যে, অর্ধ-রজনীকালে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাবাগৃহে আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন আমরা আমাদের গৃহের ছাদ হতে তার আওয়াজ শুনতে পেতাম।[৫৩]

---

[৪৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৬০৭।*
[৪৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৪।*
[৫০] *সূরা সা'দ : ২০।*
[৫১] *তাফসীরে তাবারী।*
[৫২] *আত-তাবাকাত- ১/৩৭৬, ইবনু সা'দ।*
[৫৩] *সুনান ইবনু মাজাহ্- অধ্যায় : মা জাআ ফিল-কিরাআহ ফী সালাতিল-লাইল, ১/৪২৯।*

বক্তৃতায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা

বক্তৃতা দেওয়ার সময় নম্রতা অবলম্বন করা জরুরি। রূঢ়তা ও কর্কশতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾

"অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; আর তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংস্পর্শ থেকে সরে পড়ত, অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কার্য সম্পর্কে তাদের সাথে পরামর্শ করো; অতঃপর যখন তুমি কোনো দৃঢ় সঙ্কল্প করলে আল্লাহর প্রতি ভরসা করো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালোবাসেন।"[৫৪]

বিরোধীদের সাথেও আল্লাহ নম্রভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)-কে উদ্দেশ করে বলেন,

﴿اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى﴾

"তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকটে যাও। নিশ্চয়ই সে উদ্ধত হয়েছে। অতঃপর তার সাথে নরমভাবে কথা বলো। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"[৫৫]

একাই বক্তৃতা দেওয়ার মানসিকতা পরিহার করা

অনেকে আছেন কেবল নিজেই অধিক কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন। অন্যকে কথা বলার সুযোগ কম দেন। এরূপ মানসিকতা পরিহার করা আবশ্যক; বরং অন্যের কথা শুনতে হবে ও তাদেরকে বলার সুযোগ দিতে হবে। আর কোনো মজলিসে কথা বলার ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রাধান্য দিতে হবে। হাদীসে এসেছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَمَّطُ فِيْ دَمِهِ قَتِيْلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ فَتُبْرِيْكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ فَقَالُوْا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

সাহ্‌ল ইবনু আবূ হাসমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাহল ও মুহায়্যিসাহ্ ইবনু মাস'ঊদ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইহূদীদের সঙ্গে সন্ধি ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহায়্যিসাহ 'আব্দুল্লাহ বিন সাহলের নিকট আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখন মুহায়্যিসাহ তাঁকে দাফন করলেন। অতঃপর মদীনায় এলেন। আব্দুর রহমান ইবনু সাহল ও মাস'ঊদের দুই পুত্র মুহায়্যিসাহ ও হুওয়ায়্যিসাহ নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কথা বলার জন্য এগিয়ে এলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও'। আর আব্দুর রহমান ইবনু সাহ্‌ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন বয়সে সবচেয়ে ছোট। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিসাহ ও হুওয়ায়্যিসাহ উভয়ে কথা বললেন।[৫৬]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রবীণ সাহাবীদেরকে ডাকতেন, তখন সেই সাথে আমাকেও ডাকতেন। আর বলতেন, তারা যতক্ষণ কথা না বলেন, ততক্ষণ তুমি কথা বলো না। একদিন আমাকে ডেকে বললেন, লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে (অর্থাৎ- তার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন, তা তো তোমরা জেনেছ। অতএব তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদ্‌র তালাশ করো। যে কোনো বেজোড় রাতে তোমরা তার সাক্ষাৎ পাবে'।[৫৭] *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[৫৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৫৯।*
[৫৫] *সূরা ত্ব-হা : ৪৩-৪৪।*
[৫৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৭৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৬৯।*
[৫৭] *আহমাদ- হা. ৮৫; সহীহুল ইবনু খুযায়মাহ্- হা. ২১৭২-৭৩।*

ক্বাসাসুল হাদীস

জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র মেহমানদারী

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

মেহমানদারীকে ইসলামে উত্তম গুণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেহমানের সম্মান করতে তাকিদ দিয়েছেন। মেহমানের যথাযথ আপ্যায়ন ও কদর করা একজন মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য। মেহমানদারী মানুষে-মানুষে বন্ধন দৃঢ় করে। সম্পর্কের গুরুত্ব বাড়ায়। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। মেহমানদারী সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। মেহমানদারীতে আছে আনন্দ ও পুণ্য। এটি কল্যাণ ও মহত্ত্বের পরিচায়ক। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সমাদর করে।'[৫৮]

জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খন্দকের (পরিখা) যুদ্ধে আমরা গর্ত খোঁড়ার সময় একটি কঠিন পাথর বের হলো। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে সাহাবীরা বললেন, খন্দকে একটি কঠিন পাথর বেরিয়েছে। তিনি বললেন, আমি নামছি, তারপর তিনি উঠে দাঁড়ান। ক্ষুধার কারণে তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। আমরা তিনদিন পর্যন্ত কিছুই মুখে দেইনি। একটি কোদাল হাতে নিয়ে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাথরে আঘাত করলেন, অমনি পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে বালিতে পরিণত হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটু বাড়ি যাবার অনুমতি দিন। তারপর বাড়িতে গিয়ে আমি স্ত্রীকে বললাম, আমি যে অবস্থায় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখে এসেছি, তাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তোমার নিকট কি কিছু আছে? সে বললো, আমার নিকট কিছু যব ও একটি ছাগলের বাচ্চা আছে। আমি ছাগল ছানাটি যবাই করলাম এবং যব পিষলাম। তারপর পাত্রে গোশত চড়িয়ে দিয়ে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে উপস্থিত হলাম। ইতোমধ্যে আটা রুটি তৈরির উপযুক্ত হয়ে গেল এবং চুলার পাত্রে গোশত রান্না হয়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অল্প কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে আপনি সাথে একজন অথবা দু'জন লোক নিয়ে চলুন। তিনি প্রশ্ন করলেন কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তাকে পরিমাণ খুলে বললাম। তিনি বললেন, এতো অনেক বেশ ভালো। তুমি তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন পাত্র না নামায় এবং চুলা থেকে রুটি বের না করে। তারপর তিনি সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, সবাই চলো।

অতএব, মুহাজির ও আনসার সকলেই রওয়ানা দিলেন। আমি স্ত্রীর নিকট এসে বললাম, তোমার ওপর মহান আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আনসার, মুহাজির ও তাঁর সাথের সবাই এসে গেছেন। সে বললো, তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা প্রবেশ করো, কিন্তু ভিড় করো না। অতঃপর তিনি রুটি টুকরো টুকরো করে তার ওপর গোশত দিতে লাগলেন এবং পাত্র ও চুলা ঢেকে দিলেন। তিনি তা থেকে সাহাবীদের কাছে এনে ঢেলে দিতেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো করতেই থাকলেন এবং তাতে তরকারি ঢেলে দিতে থাকলেন। অবশেষে সকলেই পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেলেন এবং কিছু অবশিষ্টও থাকলো। অবশেষে তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, এগুলো তুমি খাও এবং অন্যদেরকে উপহার দাও। কারণ, লোকেরা ক্ষুধার্ত।[৫৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, পরিখা খননের সময় আমি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে ক্ষুধার ভাব দেখতে পেয়ে আমার স্ত্রীর নিকট ফিরে এলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কিছু আছে কি?

★ *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১৩৬।*

[৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩০৭০, ৪১০১, ৪১০২; সহীহ মুসলিম- হা. ২০৩৯।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমি খুবই ক্ষুধার্ত দেখেছি। সে আমাকে এক সা‘ যব ভর্তি একটি থলে বের করে দিলো। আমাদের পালিত একটি ভেড়ার বাচ্চা ছিল, আমি তা যবাই করলাম। সে যব পিষে ফেললো। অবসর হয়ে আমি গোশত টুকরো করে হাঁড়িতে চড়িয়ে দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে যেতে প্রস্তুত হতেই আমার স্ত্রী বললো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের সামনে আমাকে লজ্জিত করো না। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গোপনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছিল, আমি তা যবাই করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা‘ যব পিষে আটা প্রস্তুত করেছে। সুতরাং দয়া করে কয়েকজন লোকসহ আপনি চলুন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে খন্দকবাহিনী! তোমাদের জন্য জাবির মেহমানী (বড় খানা) তৈরি করেছে, সুতরাং সবাই চলো। নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে পাত্র নামিও না এবং রুটিও তৈরি করো না। আমি চলে আসলাম এবং নবী (ﷺ) সকলকে নিয়ে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট এসে এ ঘটনা বললে সে বললো, তুমিই লজ্জিত হবে, তুমিই অপমানিত হবে। আমি বললাম, তুমি যা বলে দিয়েছিলে, আমি তো তাই করেছি। তারপর সে খামির করা আটা বের করে দিলো। তিনি (নবী) (ﷺ) তাতে মুখের লালা মিশিয়ে বরকতের দু‘আ করলেন। এবং হাঁড়ির নিকট এসে তাতেও মুখের লালা দিয়ে বরকতের দু‘আ করলেন। তারপর বললেন, রাঁধুনীকে ডাকো। তোমাদের সাথে সে রুটি পাকাবে এবং ডেকচি থেকে গোশত বের করবে, কিন্তু চুলা থেকে তা নামাবে না। লোকসংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা সবাই পেট পূর্ণ করে খাবার খেলেন এবং অবশিষ্টও রইলো। এদিকে আমাদের হাঁড়িতে জোশ মারার শব্দ হচ্ছিল এবং একইভাবে রুটিও বানানো হচ্ছিল।[৬০] ❑

[৬০] *রিয়াযুস্ সালেহীন- হা. ৫২৫।*

আল কুরআনে একটি ঘটনা ও কিছু শিক্ষা

[১৩ পৃষ্ঠার পর]

৩৩) কেউ যদি তাঁর বন্ধুকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় তাহলে বন্ধুকে ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিতে হিবে, কী কারণে তাঁকে দূরে সরানো হচ্ছে। বন্ধুরও উচিত গণ্ডগোল সৃষ্টি না করে বিষয়টি মেনে নেওয়া। যেমনটি করেছিলেন খিযির এবং মূসা (আলাইহিমাস সালাম)।

৩৪) আল্লাহ তা‘আলা যা ভালো মনে করেন তাই করেন। যদিও তা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। যেমন- খিজির কর্তৃক নিষ্পাপ একটি শিশুকে হত্যা করা। বাস্তব জীবনেও আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকি। হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়া, পরীক্ষায় ফেল করা, অকালে সন্তানের মৃত্যু ইত্যাদি।

৩৫) মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। সে যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন। সকল জ্ঞানীর উপর আছেন একজন মহা জ্ঞানী। চড়ুই পাখি সাগর থেকে এক ঠোকর পানি উঠানোর পর খিযির (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে লক্ষ্য করে বললেন, মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞানের উদাহরণ হচ্ছে বিশাল সাগর থেকে এই পাখিটি যে পরিমাণ পানি পান করেছে, মহান আল্লাহর জ্ঞানের সাগর থেকে আপনি ও আমি কেবল সে পরিমাণই সংগ্রহ করেছি।

৩৬) কথা ও কাজের মাধ্যমে কোনো জিনিষের শিক্ষা দেয়া শুধু কথার মাধ্যমে তা শিক্ষা দেয়ার চেয়ে অধিক মজবুত হয়। খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) সাক্ষাত করলেন, তখনই তিনি বলে দিতে পারতেন, যে আমি কিন্তু এই এই কাজগুলো এই এই উদ্দেশ্যে করব। তার প্রতিবাদ করা তোমার জন্য ঠিক হবে না। এভাবে শিক্ষা দিয়ে তিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বিদায় করে দিতে পারতেন। তা না করে তিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে সাথে নিয়ে কাজগুলো করে দেখালেন।

৩৭) যারা খিযির (আলাইহিস সালাম)-কে নবী মনে করেন না তাদের মত, এই ঘটনা থেকে কারামতে আওলীয়া সত্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ নবী-রাসূল থেকে এ ধরনের কাজ হলে তা মুযিজা হিসেবে গণ্য হবে। আর এ কথা সত্য যে, আমরা কারামতে আওলীয়াতে বিশ্বাস করি।

৩৮) যে কাজগুলো খিযির (আলাইহিস সালাম) করেছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। আল্লাহ শুধু তাঁর মাধ্যমে এগুলো সংঘটিত করলেন। আল্লাহ তা‘আলা খিযির (আলাইহিস সালাম)-এর উক্তি বর্ণনা করে বলেন : আমি নিজ মতে এটি করিনি। ❑

বিশেষ মাসায়িল

নিকাহে শিগার বা ক্রসিং বিয়ে কী বৈধ

আরাফাত ডেস্ক : আমাদের সমাজে কখনো কখনো দেখা যায় যে, একজনের ছেলে ও মেয়ের সাথে অন্যজনের ছেলে ও মেয়ের ক্রসিং পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পাদন করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো– শরিয়তে এ জাতীয় ক্রসিং বিয়ে কি বৈধ না-কি নিষিদ্ধ?

এই জাতীয় ক্রসিং বিবাহকে আরবিতে নিকাহে শিগার বলা হয়। এই নিকাহে শিগার বা ক্রসিং বিয়ের (যাকে অদল-বদল বিয়েও বলা হয়) তিনটি পদ্ধতি আছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হারাম, আরেকটি বিরোধপূর্ণ হলেও সঠিক মতানুযায়ী হারাম এবং আরেকটি হালাল। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১ম পদ্ধতি– হারাম : যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে যে, আমি আমার ছেলেকে তোমার মেয়ের সাথে বিয়ে দিব। তবে শর্ত হলো– তোমার ছেলেকে আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে কোনো মোহর থাকবে না। অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমার সাথে তোমার মেয়েকে অথবা বোনকে বিয়ে দাও এবং তার পরিবর্তে আমি আমার মেয়েকে অথবা বোনকে তোমার সাথে বিয়ে দিবো। আর এতে কোনো মোহর থাকবে না। অর্থাৎ- এখানে দু'টি বিষয় থাকবে। যথা-

এক. বিয়েতে এই শর্ত থাকবে যে, 'একে অপরের ছেলে/মেয়ের বিয়ে দিবে বা অদল-বদল বিয়ে হবে। এই শর্ত পূরণ না হলে বিয়ে হবে না।

দুই. উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বিয়েকেই মোহরের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। আলাদা কোনো আর্থিক মোহর নির্ধারণ করা হবে না। এটি নিষিদ্ধ শিগার বা ক্রসিং বিবাহের অন্তর্ভুক্ত। এটি হারাম। এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো–

حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ الشِّغَارِ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। 'শিগার' হলো– "কোনো ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে বিয়ে দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের সাথে বিয়ে দিবে এবং এক্ষেত্রে কোনো মোহর থাকবে না।"[৬১] আরেকটি হাদীস হলো–

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِيْ ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِيْ أَوْ أُخْتِيْ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, শিগার বিবাহ এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমার সাথে তোমার মেয়েকে অথবা বোনকে বিয়ে দাও এবং তার পরিবর্তে আমি আমার মেয়েকে অথবা বোনকে তোমার সাথে বিয়ে দিবো, আর এতে কোনো মোহর থাকে না।[৬২]

২য় পদ্ধতি– অগ্রাধিকারযোগ্য মতে হারাম : উপরে বর্ণিত হুবহু একই পদ্ধতি। তবে পার্থক্য হলো– এখানে আর্থিক মোহর নির্ধারণ করা হবে (কম বেশি যাই হোক)। অর্থাৎ- এখানে 'একে অপরের ছেলে/মেয়ের বিয়ে বা আদল-বদল বিয়ের' শর্ত ঠিক থাকবে। কিন্তু পাশাপাশি মোহরও নির্ধারণ করা হবে। এ বিয়ের ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও সঠিক কথা হলো– এটিও নিষিদ্ধ শিগার বা ক্রসিং বিয়ের অন্তর্ভুক্ত। এটি হারাম। কেননা, এখানে বদল বিয়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং তা 'শিগার' বিয়ে হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ পক্ষে মত দিয়েছেন আল্লামা বিন বায এবং সৌদি আরবের ফাতাওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি *(লাজনাহ দায়েমা)*।

৩য় পদ্ধতি– বৈধ/হালাল : উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী একে অপরের মেয়ে বা বোনের বিবাহ দিবে। কিন্তু এখানে উপরোক্ত দু'টি জিনিস থাকবে না। যথা-

এক. একে অপরের মেয়ে বা বোনের বিয়ের শর্ত থাকবে না। অর্থাৎ- এক বিয়ের সাথে অপর বিয়ে নির্ভরশীল হবে না।

দুই. উভয় পক্ষের ছেলে/মেয়ের বিয়েতে যথারীতি মোহর থাকবে। এই বিয়ে হালাল। এটি নিষিদ্ধ শিগার বা ক্রসিং বিয়ের অন্তর্গত নয়।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত বিয়েতে যদি ৩য় পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় তাহলে তা বৈধ; অন্যথায় বৈধ নয়। অর্থাৎ- উক্ত বিয়েতে অদল-বদল বিয়ের শর্তারোপ থাকবে না এবং শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে মোহর নির্ধারণ করা হবে। তাহলে তা বৈধ হবে। ❑

[৬১] *বুখারী- পর্ব ৬৭/২৭, হা. ৫১১২; মুসলিম- ১৬/৬, হা. ১৪১৫।*

[৬২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫১১২, ৬৯২০; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪১৫।*

সমাজচিন্তা

শিক্ষার্থী নিপীড়ন (Bullying) বন্ধে আজই সচেতন হোন

–মো. আরিফুর রহমান*

প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে আমরা চাই বা না চাই নানান রকম নিপীড়ন (Bullying) আছেই। আমরা কি আমাদের ছেলে মেয়ে বা শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাই তোমরা স্কুলে কী ধরনের সমস্যায় পড়ো? তোমাদের শিক্ষক কি তোমাদের গালমন্দ করেছেন? তোমার সহপাঠী কি তোমাকে ধমক দিয়েছে, গালমন্দ করেছে, তোমার জিনিস তোমাকে না বলে নিয়েছে শুধু আনন্দ পাবার জন্য বা মজা দেখার জন্য? এই রকম শত শত প্রশ্ন থাকতে পারে সচেতন অভিভাবকদের। আপনারও এই সব প্রশ্ন এবং উত্তর জানা দরকার। শিক্ষক এবং অভিভাকরা এ সব বিষয়ে খোঁজ খবর রাখবেন। এটা অবশ্যই তাদের দায়িত্ব। স্কুল সংস্কৃতিতে এই বিষয়গুলো প্রভাব রাখে। এটা শিক্ষার্থীদের মন ও মননে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। ইংরেজিতে নিপীড়নের নাম Bullying। Bullying-এর সরাসরি বাংলা অর্থ করলে আসে গুণ্ডামি। আমরা এতো কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে চাই না। তবে সহজ শব্দ ব্যবহার করলেও বুলিং কিন্তু গুণ্ডামির চেয়েও ভয়ানক। মজা করে কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা, শার্টে ময়লা লাগিয়ে দেওয়া, নতুন বা পুরাতন বইয়ের মলাটে একটা অবাঞ্ছিত দাগ টেনে দেওয়া, রাস্তার পাশে পানি জমে রয়েছে সেই পানিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে সহপাঠী বা জুনিয়র কারোর গায়ে লাগিয়ে দেওয়া, গালমন্দ করা সবই কিন্তু এই নিপীড়ন বা বুলিংয়ের আওতায় পড়ে। শিশুরা যদি বুলিংয়ের শিকার হয় তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই কারণেই। সুতরাং শিক্ষক ও অভিভাবক এই বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকবেন।

* *আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার।*

মোটামুটি স্কুলের নিপীড়নকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। শারীরিক আক্রমণ, আবেগীয় আঘাত বা গালমন্দ করা এবং সম্পদ নষ্ট করা।

আমরা Bullying-কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলোচনার জন্য উইকিপিডিয়া থেকে একটু বুঝার চেষ্টা করবো। উইকিপিডিয়া বলছে, Bullying is the use of force, coercion, hurtful teasing or threat, to abuse, aggressively dominate or intimidate. অর্থাৎ- বুলিং হলো বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি, আঘাতমূলক জ্বালাতন বা হুমকি, অপব্যবহার, আক্রমণাত্মকভাবে আধিপত্য বা ভয় দেখানো।

উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞাটি আমার নিকট যথার্থ মনে হয়েছে। তবে আমরা বাংলা ভাষায় বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার জন্য এর অর্থ করবো উৎপীড়ন বা নিপীড়ন।

ইংরেজি Bully শব্দটার উৎপত্তি কিন্তু অন্যরকম ছিল। ১৫৩০ সালে শব্দটা প্রথম ব্যবহৃত হয়। কী বুঝাতে এটি ব্যবহৃত হতো জানেন? নারী পুরুষকে এবং পুরুষরা নারীকে Sweetheart বুঝাতে এই শব্দটা ব্যবহার করে থাকতো। লাভার অথবা ভাই বুঝাতেও তখন এটি ব্যবহৃত হয়েছে। ১৭ শতকের দিকে এসে এই শব্দের ব্যবহারে অবনতি দেখা দেয়। তখন 'দুর্বলের প্রতি নিপীড়ক' অর্থে এর ব্যবহার শুরু হয়। ক্রিয়া পদ হিসাবে Bully শব্দটা ১৭১০ সালে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

Bullying বা নিপীড়ন একা করা যায় এবং দলবদ্ধভাবেও করা যায়। তখন এর নাম হয় Mobbing। নিপীড়কের এক বা একাধিক অনুসারী থাকতে পারে। তারা স্বেচ্ছায় অন্যকে কষ্ট দিতে বা নিপীড়ন করতে নিপীড়ককে সহায়তা করে। কেমন করে সহায়তা করে? মনে করেন একটা ছেলে স্কুলের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে। নিপীড়কদের একজন বলে উঠলো, তোর কলমটা পড়ে গেছে। যাকে বলা হলো সে ছেলেটি পেছনে তাকালো। তখন নিপীড়কবাহিনী হা হা হা করে হেসে উঠলো। অর্থাৎ- হা হা করে হেসে তারা নিপীড়নে অংশ নিলো। এখানে হাসি হলো নিপীড়নের হাতিয়ার। তখন বুলিংয়ের শিকার হওয়া

ছেলেটার কেমন লাগবে বলেন? নিশ্চই ভালো লাগার কথা নয়। স্কুলে বা কর্মক্ষেত্রের এ সব নিপীড়নকে দলগত নিপীড়ন বা পিয়ার অ্যাবিউজ বলে।

ব্যক্তিগতভাবে নিপীড়নের পেছনে কারণ হলো নিপীড়নকারী যাকে নিপীড়ন করে তার চেয়ে নিজেকে একটু ভিন্ন মনে করে, একটা ক্ষমতাবান মনে করে। অন্যের উপরে ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করে বা নিজেকে ক্ষমতাবান প্রমাণ করার জন্য এটি করে। ইদানিং কিশোর গ্যাং বা ইভটিজাররা কিন্তু এই ধরনের কাজও করছে!

বুলিং বা নিপীড়নের প্রকারভেদ : কিছুকাল পূর্বেও বুলিংকে তিনভাগে ভাগ করা হতো। মনস্তাত্ত্বিক বা আবেগীয়, মৌখিকভাবে আক্রমণ এবং শারিরীক নিপীড়ন। এখন আর একটা মাধ্যম যুক্ত হয়েছে তা হলো সাইবার বা অনলাইন ভিত্তিক নিপীড়ন। অনেকভাবেই আমাদের শিক্ষার্থীরা বা ছেলে-মেয়েরা নিপীড়নের শিকার হয়। আমাদের পরিচিত কিছু মৌখিক নিপীড়ন কেমন হয় তা দেখে নিই।

অবমাননাকর নাম ধরে ডাকা, বা কারোর অপছন্দীয় নামে বার বার ডাকা। কারোর সম্পর্কে গুজব ছড়ানো বা কারো সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করা। কাউকে হুমকি দেওয়া। অভদ্র বা নির্দয়স্বরে কারোর সাথে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই চিৎকার করে কথা বলা। কারো কণ্ঠস্বর বা কথা বলার ধরণ নিয়ে উপহাস করা, কাউকে দেখে হাসা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। কাউকে কষ্ট দিতে শারীরিক ভাষা ব্যবহার করা, বিশেষ করে শরীরের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নির্দেশ করা। অপমান করা বা কাউকে উপহাস করা এ সবই হলো মৌখিক নিপীড়ন বা বুলিং।

নিপীড়ন করতে যে বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসা হয় তা হলো যেমন কারোর মোটা শরীর নিয়ে উপহাস, হালকা পাতলা শারিরীক গড়ন নিয়ে মশকরা করা, বাবার পেশা, মায়ের পেশা, দরিদ্র পরিবার, গায়ের রঙ, প্রতিবন্ধিতা, নাম, স্কুলের মন্দ ফলাফল বা ভালো ফলাফল, কথা কম বা বেশি বলা, বাড়ি বা গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, অতীতে কোনো অপ্রত্যাশিত অপরাধ বা কাজ ইত্যাদি নিয়ে অপদস্ত করা। সাধারণভাবে যারা নিপীড়ন করে তারা নিজেদেরকে স্মার্ট মনে করে। পরশ্রীকাতরতা বা হিংসাও নিপীড়ন করার একটা কারণ।

সাইবার বুলিং বা নিপীড়ন বিষয়ে আলোচনা করা এখন সময়ের দাবি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যেমন ফেইসবুক, মেসেঞ্জার, ইউটিউব, ওয়াট্‌সআপ, ভাইবার, ইমো এবং টেলিগ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করে বা ইমেইলের মাধ্যমে কাউকে ভোগান্তি দেওয়া সাইবার নিপীড়নের আওতায় পড়ে। সাইবার নিপীড়নের কারণে সারা বিশ্বজুড়ে এক ভয়ানক অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষ করে স্কুলগামী কম বয়সি শিক্ষার্থীরা এর ঝুঁকিতে পড়েছে বেশি। অপ্রত্যাশিত ভিডিও কল, অডিয়ো বার্তা, অশ্লীল ভিডিও ক্লিপ, লিখিত মেসেজে ইনবক্স পূর্ণ ভরে যাচ্ছে। মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়ছে। কিশোরীদের অনেকে নিজেদের গোপনীয়তা প্রকাশ পাওয়াতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

কেন নিপীড়ন করে : আগেই বলা হয়েছে যে, নিজেকে স্মার্ট হিসাবে দেখানোর জন্য এটা করে থাকে। সাইকোলজিস্টরা বলছেন হতাশা, দুর্বল আবেগ, ব্যক্তিত্বসংকট থেকেও মানুষ অন্যকে নিপীড়ন করে থাকে। কেউ কেউ মজা নেবার জন্য নিপীড়ন করে। এটা এক ধরনের অসুখ বা সুস্থতা বলা চলে। কেউ রাগ এবং ক্ষোভ বা না পাওয়া থেকেও নিপীড়ন করে থাকে।

ভুক্তভোগীর লক্ষণ ও প্রভাব : নিপীড়িত হয়েছে এমন কারোর চেহারা থেকে বুঝা যাবে সে ভুক্তভোগী। কখনো কখনো একাকি কাঁদবে। একাকি বোধ করে। পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, স্কুলে যেতে চাইবে না। নিপীড়নের শিকার যে কেউ সহপাঠীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। ভুক্তভোগীদের প্রায়ই শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি আবেগগতভাবে সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে। নিপীড়নের শিকার বা ভুক্তভোগীরা স্কুলে যেতে ভয় পায়, মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয় বা ক্ষুধা কমে যায়, স্কুলের কার্যকলাপে আগ্রহ দেখায় না। বন্ধু বা পরিবারের সাথে সময় কাটানোর আগ্রহ থাকে না, জনসমক্ষে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মোটকথা বার বার বুলিং বা নিপীড়নের শিকার হলে যে কারোর জীবন আর স্বাভাবিক থাকে না।

নিপীড়ন বন্ধে করণীয় : ইসলাম ধর্ম যথাযথভাবে অনুসরণ করলে নিপীড়ন বন্ধে আর কিছু প্রয়োজন হতো না। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে শত শত জায়গায় এ সব বিষয়ে বলা হয়েছে। মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। অন্যের কষ্টে হেসো না। অন্যকে মন্দ নামে ডাকিও না। ঠাট্টা মশকরা করিও না। অযথা কাজ করো না। গালমন্দ করো না। বাজে কথা বলো না। অন্যের সম্পদ আত্মসাত করো না। ইত্যাদি বিষয় মেনে চললে কেউ কি নিপীড়ন করতো? না কেউ নিপীড়নের শিকার হতো?

বাবা মা, অভিভাবক এবং শিক্ষক যারা নিপীড়নের শিকার তাদের পাশে দাঁড়াবেন, তাদেরকে সমর্থন করবেন, মানসিক শক্তি যোগাবেন। স্কুলে বা কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে নিপীড়ন বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করবেন। যারা বুলিং করে তাদেরকে বোঝাবেন কেন নিপীড়ন বা বুলিং ভালো নয়। তোমার সাথে এই এই আচরণ করা হলে তুমি কেমন বোধ করতে?

স্কুলে সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। যারা নিপীড়ন করছে এবং নিপীড়িত হচ্ছে তাদের একত্রে দলগত কাজ দিয়ে, খেলার সুযোগ দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। কীভাবে বুলিং বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ। থানা পুলিশ, শিক্ষা অফিস এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র প্রমাণ করবে আমরা শিশুদের পাশে এবং শিক্ষার্থীদের পাশে রয়েছি।

সপ্তাহে অন্তত একদিন আপনার সন্তানের নিকট জানতে চান স্কুলে তার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না। অথবা ইতিবাচকভাবে জানতে পারেন, তোমার স্কুলের কোন কোন বিষয়গুলো তোমার পছন্দ হয়? কোন কোন বিষয়গুলো মনে হয় পরিবর্তন করা দরকার? স্কুলের শিক্ষকরাও এমন জানতে চাইতে পারেন। শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ দিতে পারেন। সব থেকে মজার ব্যাপার হলো আপনি এই ধরনের কাজ করে সহজে গবেষক হয়ে যেতে পারেন। শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের নিকট প্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। আমি মনে করি, আমাদের সন্তানদের বা সন্তানকে প্রতিদিন জিজ্ঞাস করা উচিত তার স্কুলের আজ কোন বিষয়টি ভালো লেগেছে? কোন বিষয়টি আরও ভালো হওয়া দরকার ছিল। আপনার সন্তান বা শিক্ষার্থীরা যদি বলতে না পারে তাকে সহযোগিতা করতে পারেন। বন্ধুদের কোন ব্যবহার তোমাদের ভালো লেগেছে? শিক্ষকের কোন আচরণ আরও উন্নত হওয়া দরকার? দেখবেন তারা ধীরে ধীরে বলতে শিখবে। আপনি কি জানেন শুধু সহপাঠীরা নয় শিক্ষকও অন্য শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের নিপীড়ন বা বুলিং করে থাকে? কেউ পড়া না পারলে বলে দিলেন, তুই অমুকের ছেলে না! তোকে দিয়ে কিছু হবে না। এটা কিন্তু মৌখিক নিপীড়ন।

অনেকেই বলে থাকেন বুলিং বা নিপীড়নের মাধ্যমে আমরা শিখে থাকি। এটা আমাদের জীবনের পাঠ শেখায়। যেমন- শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ হেলেন গুলবার্গ বলেন, বুলিংয়ের লক্ষ্যবস্তু হওয়া একটি শিশুকে শেখাতে পারে কীভাবে জীবনে দ্বন্দ্বসমূহ পরিচালনা করতে হয় এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষমতা বাড়াতে হয়।

তবে এই মতামতের বিরোধীতা করেছেন অনেকেই। তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে হেলেন গুলবার্গ-এর তত্ত্ব।

বুলিং বন্ধের জন্য আমরা স্কুলে দলগত কাজ করতে পারি। শোভাযাত্রা বের করতে পারি। স্লোগান লিখে স্কুলের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পারি। এ বিষয়ে অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার জন্য নিয়মিত প্রোগ্রাম রাখতে পারি। অভিভাবক সমাবেশে এ বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করতে পারি। দৈনিক স্কুল সমাবেশে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। নিপীড়ককে জরিমানা করতে পারি। তাদের অভিভাবকদের ডেকে বিষয়টি আলোচনা করতে পারি। ইতিবাচকভাবে আমাদের সন্তানদের সাথে আচরণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সাথেও। আমাদের শিক্ষকদেরকে চাইল্ড সাইকোলজি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষককে নিপীড়ন রোধে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক জাতির সংস্কৃতি বদলে দিতে পারে। জাতিগঠনে অবদান রাখতে পারে। ❑

ইতিহাস-ঐতিহ্য

শহীদি রক্তে স্নাত ঐতিহাসিক কারবালা

–সহকারী অধ্যাপক মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম*

[প্রথম পর্ব]

আরবী মুহার্‌রাম মাস আসার সাথে সাথে, শুরু হয় কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানান বক্তৃতা, সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনদেরকে দোষাদোষী, গালিগালাজ, বকাঝকা ছাড়াও নিজেদের ভিতর একে অপরকে কাফের মুশরিক ইত্যাদি ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করে। সেটা আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় মুহার্‌রাম মাসের দশ তারিখে। কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে। নিজের পক্ষে নিতে গিয়ে ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণের ধার ধারে না, খুঁজে গল্প, খুঁজে উপন্যাস, খুঁজে কল্পকাহিনী, নিজের বানোয়াট তথ্য তো আছেই। কেউবা গায়ক, কবিয়াল, আউল, বাউল ফকিরের গানের উপর নির্ভরশীল, কেউবা সাহিত্য উপন্যাসের উপর নির্ভরশীল, কেউবা মুসলিমদের চিরশত্রু ইয়াহূদী খ্রিষ্টান ও নাস্তিকদের লিখে যাওয়া ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। কেউবা মুসলিমদের ভিতরে বিদ্বেষ ছড়ানো লেখকদের বই-পুস্তক এর উপর নির্ভরশীল। লেখকরা কাউকে বানিয়েছে তারা চিরশত্রু, কাউকে বানিয়েছে চিরবন্ধু, কারো উপর চাপিয়েছে দোষের পাহাড়, কাউকে বানিয়েছে দুধে ধোয়া তুলসী পাতা। কাউকে গালি দেওয়ার জন্য খুলে দিয়েছে দোয়ার, কারো প্রশংসার জন্য করে দিয়েছে দোয়ার উন্মোচিত। ওইসব লেখকরা মুসলিমদের ভিতরে দলে-উপদলে বিভক্ত করে চির শত্রুতে পরিণত করেছে। শত শত বছর ধরে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে লড়ছে। কেউ দশজন লেখকের দশটি ইতিহাস পড়ে সত্য কথাটি বলতে চান না। এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যে সকল বিরাট ব্যক্তিত্ব মনীষী সম্মান খ্যাতি ও মর্যাদার উচ্চমানে উন্নীত হয়েছে, পৃথিবী তাদের বেশি অনুসন্ধান করে, ইতিহাসের চেয়ে উপন্যাসের ভিতরে, তাদের খুঁজে বেড়ায় কল্পনার মহারাজ্যে। এই জন্যই ঐতিহাসিক দার্শনিক ইবনু খালদুন যথার্থই বলেছেন, পৃথিবীর যে ঘটনা যত বিখ্যাত হবে কল্পনা ও রূপকথা সেটাকে ততই আপন আশ্রয়ে টেনে নিবে। ছোট কে বড় করে তছ্‌নছ্‌ করে দেয় সবকিছু, দেয় মানুষের মুভমেন্ট ঘুরিয়ে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করে রূপকথার গল্প। এতে পড়ে, কেউ করে হা-হুতাশ, কেউবা রক্তারক্তি, কেউবা প্রশংসার ডালি নিয়ে বসে, কেউবা চোখের জল ফেলে খালকে করে সাগর, কেউবা বুক চাপড়িয়ে আত্মহুতি দিতে চায়। কেউবা সাবুলে আঘাত করে জান্নাতের দরজা খুলে নিতে চায়, কেউবা কাউকে জাহান্নামের অতল গহব্বরে পাঠিয়ে দিতে চায়।

আসলেই এ ঘটনার সাথে কুরআন হাদীস ও ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা আলোচনার মাধ্যমে যথার্থই প্রতীয়মান। একজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় টিকে থাকবে, আরেকজন টেনেহিঁচড়ে তাকে নামাবে, পক্ষে বিপক্ষের দুই গ্রুপে ভুল বুঝিয়ে দুই নেতাকে বাহবা দিতে দিতে কারবালার মতো হত্যাযজ্ঞের সৃষ্টি করে শত শত শহীদের রক্তে স্নানিত করে কারবালা কে। আর শাণিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার। দুয়ার খুলে দেয় লেখকদের, লেখতে থাকে ইতিহাস পক্ষে-বিপক্ষে আউল বাউলেরা গাইতে থাকে গান, সৃষ্টি হয় সাহিত্য, উপন্যাস, কল্প কাহিনী, গল্প, চিরদিন দ্বন্দ্বের মাঝে বেঁচে থাকা জাতি, সে জাতির নাম মুসলিম জাতি। মহানবী (ﷺ)-এর ইন্তেকাল দশম হিজরি অর্থাৎ- ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে। খিলাফতের যুগ ৬৩২-৬৬১ পর্যন্ত, অর্থাৎ- ৬১/৬২ হিজরি, যা মহানবী (ﷺ) ইন্তেকালের ৫২ বছর পরের ঘটনা। এটাকে আমরা ইসলামের পক্ষে-বিপক্ষে চালিয়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুল হই চই করে, স্বরগরম করে, অস্বস্তি তৈরি করি।

৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতের মধ্য দিয়ে খিলাফতের পরিসমাপ্তিতে উমাইয়া শাসনের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়। যা টিকে থাকে, (৬৬১-৭৫০) পর্যন্ত প্রায় নব্বই বছরকাল। উমাইয়াহ্‌ শাসনের উমাইয়াহ্‌ বংশের প্রথম শাসক আমিরে মু'আবিয়াহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আর সর্বশেষ শাসক দ্বিতীয় মারওয়ান তাদের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। তাদের মোট শাসকের সংখ্যা ১৪ জন। উমাইয়াহ্‌ শাসন-এর শুরুলগ্নে থেকে কুরাইশ বংশের চির দুই প্রতিদ্বন্দী শাখা উমাইয়াহ্‌ ও হাশেমীদের ঘুমন্ত দ্বন্দ্ব জেগে উঠে। শুরু হয় দ্বন্দ্বের ঝড়, সে ঝড়ের মতপার্থক্যে

---

* *(এম. ডি. এম. বি.) বি. এ (অনার্স), এম. এ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (রা. বি.), এম. এ (ডবল), ইসলামিক স্টাডিজ, (রাজশাহী কলেজ), এম. এম. কামিল হাদীস।*

যুদ্ধের মোড় নিয়ে, নিধন হতে থাকে উভয়ই বংশের লোকজন, তারই খণ্ডিত অংশ কারবালার যুদ্ধ ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর, ৬১ হিজরি, ১০ মুহার্‌রাম। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝির খেসারত, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিফিফ্‌নের যুদ্ধে ভয়াবহ রূপ ও সাহাবীদের শাহাদাতের রক্তের প্রবহমান দাগ আজো বহমান।

উমাইয়াহ্ বংশের প্রথম শাসক আমীরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি ছিলেন কুরআনের ওয়াহী লেখক, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবার ভাই, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেলক। তারই পুত্র ইয়াজিদ বা এজিদ। সে এজিদের সাথেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৌহিত্র হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কারবালার যুদ্ধ।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গবেষক লেখক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত মাও. আবুল কালাম আযাদ তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মওতকি ইনসানিয়াত" গ্রন্থে বলেন, ঘটনার উপর যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেটার বেশিরভাগই শোক গাথার সাথে সম্পৃক্ত। সেটার আসল উদ্দেশ্য হলো অশ্রুপাতের অবস্থার সৃষ্টি করা।

নিছক ইতিহাস হিসাবে বর্ণিত কতিপয় ঘটনা, যা ইতিহাসের ছাঁচেই রচিত হয়েছে, সেটা প্রকৃত ইতিহাস নয়। সেটা শোক গাঁথা এবং বৈঠকে আলোচনার একটি স্বতন্ত্র রূপমাত্র। পৃথিবীতে যে কোনো ভাষার কারবালার ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যাবে কোথাও এটার সত্যিকার ইতিহাসের অস্তিত্ব নেই। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফতের সময় রাজধানী ছিল মদিনায় ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাজধানী স্থানান্তর করেন ইরাকের কুফায়। তিনি সেখানেই ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুলজিমের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। আমিরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাজধানী নিয়ে যান সিরিয়ার দামেস্কে। তিনি ২০ বছরকাল খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার ঘটনার সময় এজিদ দামেস্কেই ছিলেন। যুদ্ধের স্থান ছিল ইরাকের ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে কুফার পথে। যাকে বলা হয় ফোরাত নদী। কুফার লোকেরা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আশ্বস্ত করলেও সহযোগিতা করেননি। তাই হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুফার লোকদের আমন্ত্রণ, মদিনার সাহাবিদের কেউ সমর্থন করেননি। বার বার যেতে বারণ করেছেন এবং বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মদিনার সাহাবীদের অংশ গ্রহণ কারবালায় ছিল বলে, ইতিহাস নীরব থেকে গেছে। বিশিষ্টজনের মধ্যে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কারবালায় যেতে নিষেধ করলেন যারা রাইসুল মুফাস্‌সেরীন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। (ইবনু জারীর, কামিল, মাকতালাল ইবনু আহনাফ) তথ্যে বলা হচ্ছে– ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুতার যুদ্ধে তিন সেনাপতি শহীদের একজন, জাফর ইবনু আবূ তালিবের পুত্র 'আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়া থেকে পত্র লেখেন কুফায় না যেতে। তিনি কিন্তু হুসাইনের বোন যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র স্বামী ও চাচাতো ভাই, তার কথাও রাখলেন না।

ইবনু জারীরের রেফারেন্স দিয়ে আবুল কালাম আযাদ লেখেন, আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর, ইয়াজিদ কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা আমর ইবনু সাদকে দিয়েও পত্র লিখিয়াছেন কুফায়, না আসার জন্য। তবুও তিনি পরামর্শ মেনে নিলেন না।

এতো অনুরোধ সত্ত্বেও স্বপরিবারে কুফার পথে পা বাড়ালেন, বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের সাথে দেখা হলে তিনি ও যেতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন কুফাবাসীর মণ আপনার সাথে, তরবারী উমাইয়াদের সাথে। এরই মধ্যেই জানতে পারলেন হুসাইনের প্রতিনিধি মুসলিম ইবনু আকিল কে, প্রকাশ্যে কুফার শাসক ওবায়দুল্লাহ হত্যা করেছে, তাতে কুফাতে গাছের পাতাও নিরব থেকেছে।

সঙ্গে থাকা অনেকেই ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলেন, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে, কারো কথাই গ্রহণ করেননি।

মুসলিম ইবনু আকিল-কে হত্যা করে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিল, ওবায়েদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ। ওবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ সে সময় স্ট্যান্ড কুফার প্রাদেশিক গভর্নর। প্রফেসর ড. আব্দুল মাবুদ, তার লেখা আসহাবে রাসূলের জীবনকথায়, উল্লেখ করেন, ঐতিহাসিকগণ একমত পোষণ করেন যে, আরব বিশ্বের চারজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যারা খুবই বুদ্ধিমান চালাক। চারজনকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।

যেমন ছিলেন, তারা দক্ষ শাসক, কূটনীতিবিদ, যুদ্ধবাজ, বক্তা, সালিশি দরবারে কূটকৌশলী। তাদের একজন আমিরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), দ্বিতীয়জন 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তৃতীয়জন মুগীরাহ্ ইবনু শুবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চতুর্থজন উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ। এই চারজনকে ঐতিহাসিকগণ আরব বিশ্বের চালাক এবং বুদ্ধিমান বলে অভিহিত করেছেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমিরে মু'আবিয়াহ্‌কে দেখে এক সময় বলেছিলেন, তুমি জনগণের সাথে ভালো ব্যবহার করো, তখন থেকে তিনি রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন,। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র

পরিচালনা করেন। এই আমিরে মু'আবিয়াহ্ বৈমাত্রেয় ভাই যিয়াদ-এর পুত্রই উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ।

যে শীমার হুসাইন-কে হত্যা করে, তার পরিচয় এটা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই শীমারের ফুফু বাণীনকে বিবাহ করেছেন, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। সে দিক থেকে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র আত্মীয়। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পত্নীর গর্ভে চারজন সন্তানের জন্ম হয়। তারা হলেন 'আব্বাস, 'আব্দুল্লাহ, জাফর, 'উসমান, সকলেই কারবালার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। শীমার ঐ চারজনকে পরামর্শ দেন, হুসাইনকে ছেড়ে চলে যেতে। সে পরামর্শ গ্রহণ না করে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন, একে একে সকলেই শাহাদত বরণ করেন। এরা ছিল শীমারের ফুফাতো ভাই 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), স্ত্রী, বাণীনের পুত্র। শীমার কুফার অধিপতির নির্দেশনায় 'আম্‌র ইবনু সা'দকে, দিয়ে সিরিয়া সৈন্যের মাধ্যমে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ঘিরে ফেলে। প্রকাশ থাকে যে, 'আম্‌র ইবনু সা'দ ছিলেন, মহানবী ﷺ-এর মামাতো ভাই সা'দ ইবনু আবূ আক্কাসের পুত্র। তিনিও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আত্মীয়। রাজনৈতিক ময়দানে কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ।

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পরিবারে কারবালার ঘটনার পর, এমন কোনো পুরুষ বুদ্ধিমান ছিলেন না যে, তিনি কারবালার যুদ্ধের বর্ণনা দিতে পারেন। কারবালার যুদ্ধের যত বর্ণনায় আসছে সবটুকুই বর্ণনা করেছেন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বোন যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। তার বর্ণনায় ইতিহাসের মৌলিক বিষয়, যার ডালপালা লেখকদের মাধ্যমে তিলকে তাল, ছোটকে বড় করে, বিশাল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তবে এটা যে বিষাদ ময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর পরিবার পুরুষ শূন্য হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকেন একমাত্র পুরুষ, রোগাক্রান্ত ২৩ বছর বয়সের জয়নুল আবেদিন। তাকেই ইতিহাসে ছোট 'আলী হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই কারবালার প্রান্তে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ অক্টোবর ৬১ হিজরির ১০ মুহার্‌রাম ঘটে যাওয়া কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায়, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পরিবারের দলে শাহাদাত বরণ করেন ৭০ জন, আর এজিদ বা উবায়দুল্লাহ্ ইবনু জিয়াদের দলে সৈনিক নিহত হয় ৭২ জন। এই ঘটনা, কোনো কালে, কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তিই সমর্থন করতে পারেননি।

আমিরে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করেন, ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। পিতার মনোনয়ন অনুসারে প্রথম এজিদ দামেস্কের সিংহাসনে বসেন। তিনি অল্প সময় শাসন ক্ষমতায় ছিলেন এবং ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এরপর দ্বিতীয় মু'আবিয়াহ্ অর্থাৎ- এজিদের পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়াহ্ ক্ষমতায় বসেন। কয়েক মাস রাজত্ব করার পরেই তিনি নির্জনে চলে যান। অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, সাথে সাথে আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এজিদের প্রতি জনগণের প্রথম অভিযোগ, তিনি একটি বানর কে ধর্মযাজকের পোশাক পরিয়ে সুসজ্জিত করে সুন্দর বেশভূষায় মণ্ডিত একটি সিরীয় গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে যেখানে যেতেন, নিয়ে যেতেন। ফলে ধর্মীয় নেতাগণ তাদের ঐরূপ অপমানে, এজিদের বিরুদ্ধে চটে উঠেন। অন্যদিকে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফতের এই ন্যায্য দাবিকে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তিনি হলেন প্রথম খলিফা আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র দৌহিত্র, আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তিনি হলেন দ্বিতীয় খলিফা 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পুত্র, অন্যজন হলেন, আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পুত্র। এই স্বনামধন্য সাহাবীরা ছাড়াও অনেকেই সমর্থন করেন। তাদের সমর্থনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই অতি আগ্রহই তাকে কারবালার প্রান্তের দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে ঘনঘন আসছে কুফা থেকে আমন্ত্রণের চিঠি।

হুসাইনকে সমর্থন জানালেও, যারাই প্রিয়ভাজন সকলেই একবাক্যে কুফার পথে পা রাখতে বারণ করেছেন। কুফাবাসী হুসাইনকে সমর্থন জানালেও উবায়দুল্লাহ এবং 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের কারণে টুঁ শব্দটিও করতে পারতেন না। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন ইয়াজিদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। অন্যদিকে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এজিদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পরামর্শ দিয়ে উত্তেজিত করেন। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুফার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তাহার চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনু আকিলকে সেখানে পাঠান। কুফাবাসী সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। মুসলিম ইবনু আকিল সে বিষয়ে পত্র লেখে হুসাইনকে আশ্বস্ত করেন। ইতিমধ্যে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ মুসলিম ইবনু আকিলকে এবং তার সহযোগীকে নির্মমভাবে হত্যা করে গাছের সঙ্গে টাংগাইয়া রাখে। কুফার জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের রাজ প্রাসাদ ঘেরাও করলে তাদেরকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

এজিদের প্রলোভনে অনেকেই তার দলে যোগ দেয়। হুসাইন মক্কা থেকে কুফার পথের কিছু মরুভূমি অতিক্রম করতেই মুসলিম হত্যার খবর জানতে পেরে ব্যথিত হন। আর অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চান। কিন্তু মুসলিমের স্বজনরা রক্তের প্রতিশোধ নিতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সম্মুখে অগ্রসর হতে না হতেই একের পর এক দুঃসংবাদ আসতে লাগল। কুফা নগরীতে হুসাইনের সমর্থক থাকলেও উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের ভয়ে কেউ বের হতে সাহস পেত না।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বশেষ পরামর্শ দিলেন কুফায় যাবেন তো, আপনার সন্তান ও মহিলাদেরকে রেখে যান। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সকল বন্ধুবান্ধব আপনজন আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদচারণায় ধন্য, মদিনার মাটি মানুষের ও হাজারো সাহাবীর স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি পিছনে ফেলে, লাখো পরামর্শের পাহাড় ঠেলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুহ্য ভাঙতে পা বাড়ালেন কুফার পথে। ফোরাত এর উপকূলে আসতে না আসতেই ঘিরে ফেলে সিরিয়া বাহিনী। অন্যদিকে একের পরে এক কুফার দুঃসংবাদের মেঘের গর্জন, অন্ধকারের অমানিশার ঘনঘটায় ঢেকে ফেলে ফোরাত উপকূলের প্রতিটি সৈকত, দূরবিদ্ধ করে তোলে রাস্তাঘাট। তাদের সজ্জিত অস্ত্রের ঝনঝনানিতে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। পানি সরবরাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, পানি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে হুসাইন-এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ। পিপাসিত বাচ্চাদের ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। আরবের জনৈক গোত্রপতি হুসাইনকে পরামর্শ দিলেন, আপনার গতিপথ পরিবর্তন করে আজা সালমা পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ২০,০০০ (বিশ হাজার) বানী-তা' য়ী সৈন্য যোগ দিবে বলে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধের আগ্রহ অনেকটাই প্রশমিত, হয়তো আঁচ করতে পেরেছিলেন, শত শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফোরাত উপকূল লালে লাল হয়ে যেতে পারে, বহু মায়ের বুক খালি হয়ে দুঃখ-বেদনা আর কষ্টের আঘাতে আঘাতে মুসলিম জাতিসত্তা ম্লান হতে পারে। যুদ্ধ কে পাশ কাটিয়ে তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই বানী তামিম গোত্রের আলহোর নামক এক আরব প্রধান এর পরিচালনায় কুফার অশ্বারোহী বাহিনী হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ঘিরে ফেলে।

৬০ হিজরির ৮ই জিলহাজ্জ, ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ১০ সেপ্টেম্বর। উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের নির্দেশ ছিল হুসাইন-এর সাথে সাথে কুফা পর্যন্ত আসবে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে জড়াবে না। আলহোর হুসাইন-এর সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করেছে বলে, ঐতিহাসিকগণ নিরব। যোহরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন সহচরকে আযান দিতে বললে, নামাযের জামা'আত হলো, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইমামতি করলেন, আল হোরের সৈনিকেরা পাহারারত ছিল। আলহোর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে এজিদের নির্দেশে 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের কড়া হুঁশিয়ারিতেই শুধু দায়িত্ব পালন করছিলেন। 'উমার ইবনু সা'দ তো হুসাইনের আত্মীয়, মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মামাতো ভাইয়ের সন্তান, তিনি যথাযথ চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে আপস-এর মাধ্যমে কোনো সুরাহা বের করা যায় কি-না। তার সকল ধরনের প্রচেষ্টাই তিল তিল করে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সময় যতই গড়তে থাকে, আশ্বস্ত করা কুফাবাসীরা ততই আত্মগোপনে চলে যায়। আশ্বস্ত আর সহযোগিতার সকল পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন একাকী হয়ে পড়েন। অসহযোগিতার ঝড়ো হাওয়ায় হুসাইনের মনের দুরন্ত গতি তখন অনেকটাই বিধ্বস্ত। সঙ্গে থাকা সন্তানাদি সকলেই চিন্তায় তখন বিমর্ষ। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সঙ্গে ছিলেন, তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, দু'জন বয়স্ক পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং ২০০জন অনুচর। ডাইনে কুফাকে রাখিয়া ক্ষুদ্র দলটিসহ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নদীর পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হতে ছিলেন। উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ, তার অধীনস্থ সেনাপতি 'উমার ইবনু সা'দের অধীনে ৪০০০জন সেনা দিয়ে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সহচরদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। অবরুদ্ধ অবস্থায় ৬১ হিজরীর ১লা মুহার্‌রাম, ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত তীরবর্তী উপকূলে কারবালা প্রান্তরে শিবির স্থাপন করতে বাধ্য হন। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাঁচা মরার লড়াইয়ে কে হারে আর কে জিতে। সিরিয়া সেনাবাহিনীর প্রধান 'উমার ইবনু সা'দ একটি ঘরোয়া বৈঠকের মধ্য দিয়ে সর্বশেষবার একটি আপোষরফা করার জন্য সিদ্ধান্ত করেন। মধ্যরাতে উভয়পক্ষের ২০জন করে সেনা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলো। কোনো সুরাহা ছাড়াই বৈঠক শেষ হলো। বাহিরে চলল অপপ্রচার, ইতিমধ্যে এজিদের পক্ষ থেকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে 'উমার ইবনু সা'দ-এর কাছে চিঠি নিয়ে এলো। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

কিশোর ভুবন

সা'ঈদ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র লোমহর্ষক কাহিনী

–আবু তাসনীম★

সা'ঈদ ইবনু 'আমের এমন ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত খরিদ করে নেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দান করেন। তাঁর পিতার নাম 'আমের এবং মাতা আরওয়া বিনতু আবী মুয়ীত। খাইবার বিজয়ের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হলেন সেই ইসলামী সাম্রাজ্যের এক মহান খলিফা। তাঁর খেলাফতকালের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যার প্রতিটিই প্রমাণ বহন করে সফল শাসনের, সৎ শাসকের। জুমু'আর খুৎবায় একজন সাধারণ নাগরিক খলিফাকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছে; আপনি খুৎবাহ্ প্রদানের আগে বলে নিন আমরা একটি করে চাদর পেয়েছি, আর আপনার শরীরে দুইটা কেন? খলিফাও কোনো প্রকার তিরস্কার হুমকি ধমকি ছাড়া জবাব দিয়েছেন। ক্ষমতাসীন একজন বাদশাকে জনসম্মুখে এভাবে প্রশ্ন করা সম্ভব হয়েছে শুধু খোদাভীতি ও আখেরাতের জবাবদিহিতার মানসিকতার কারণে।

'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র খেলাফতকালের ঘটনা। তিনি সা'ঈদ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে হিমসের গভর্নর বানিয়ে পাঠালেন। কিছুদিন পর হিমসবাসীদের এক প্রতিনিধিদল খলিফা 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র সাথে দেখা করতে এলে তিনি বললেন,

আমাকে তোমাদের দরিদ্র মুসলমানদের একটা তালিকা দাও, বাইতুল মাল থেকে কিছু মুদ্রা (টাকা-পয়সা) দিব। ঐ অঞ্চলের অভাবী লোকদের তালিকা 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র সামনে দেয়া হলো।

'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, সা'ঈদ ইবনু 'আমের কে?

তারা বললো, আমাদের গভর্নর।

তিনি বললেন, তোমাদের গভর্নর অভাবী মানুষ?

তারা বললো, আল্লাহর কসম! হ্যাঁ কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ তার চুলায় আগুন জ্বলে না।

'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঁদাতে লাগলেন, এতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। ঐ দলকে এক হাজার দিনার দিলেন এবং বললেন, আমীরুল মু'মিনীন এ উপহার প্রেরণ করেছেন যাতে করে আপনি আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

এ দল হিমস পৌঁছে স্বীয় গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র পয়গাম ও আমানত হস্তান্তর করল।

আর সা'ঈদ বারবার বলতে থাকলেন,

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"।

স্ত্রী হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি বিপদ হলো? এমন তো হয়নি যে, আমীরুল মু'মিনীন ইন্তেকাল করেছেন? তিনি বললেন, না এর চেয়ে বড় বিপদ।

স্ত্রী বললেন, কোথাও কি মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে? বললো, না এর চেয়েও বড় বিপদ হয়ে গেছে? তিনি বললেন, সম্পদ আমার পরকাল বিনষ্ট করতে চায়? ঘরে ফিতনা সৃষ্টিকারী প্রবেশ করেছে।

তিনি বললেন, তাহলে এ থেকে মুক্ত হয়ে যাও। ঘরের লোকদের তো জানা নেই যে, এ সমস্যার সম্পর্ক সম্পদের সাথে।

তিনি বললেন, স্ত্রী! তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? সে বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই। সা'ঈদ তখন সম্পদের ঘটনা খুলে বললেন। অতঃপর স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে সমস্ত দীনার গরিব দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। এ ঘটনার কয়েক দিন পরই 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হিমস গমন করলেন।

ঐ সময়ে তাকে ছোট কুফা বলা হত কারণ হিমসবাসীরা গভর্নরের বিরুদ্ধে বেশি বেশি অভিযোগ করত। আর কুফাবাসীদেরকে তো এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হত। তিনি এলাকাবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, গভর্নর সম্পর্কে তোমাদের অভিমত ও অভিযোগ কি? তার উপস্থিতিতে তার গর্ভনরের বিরুদ্ধে ৪টি অভিযোগ পেশ করা হলো।

★ *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

প্রথম : সে বেলা প্রখর হলে মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে এর পূর্বে তার সাথে সাক্ষাৎ করা কষ্টকর হয়। ‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সা‘ঈদ ইবনু ‘আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র দিকে তাকালেন এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেলেন, আমীরুল মু’মিনীন! আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম না; কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো এই যে আমার কোনো খাদেম নেই, আমার স্ত্রী অসুস্থ থাকে আমি নিজে আটা তৈরি করি এরপর তা খামীর করি এরপর রুটি তৈরি করি। ইতোমধ্যে এশরাকের সময় হয়ে যায় তখন আমি নফল নামায আদায় করি। এরপর ঘর থেকে বের হই।

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের **দ্বিতীয়** অভিযোগ কি? বললো, সে রাতে কারো সাথে সাক্ষাৎ করে না।

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সা‘ঈদ! এর কারণ কী? বললো, জনাব! আমি তা বলতে চাচ্ছিলাম না। মূলতঃ আমি সমস্ত দিনই মানুষের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আর রাত আমার প্রভুর জন্য ওয়াকফ করেছি।

জিজ্ঞেস করলেন **তৃতীয়** অভিযোগ কি? মাসের মধ্যে একদিন এমন হয়ে যায় যে, সে ঘর থেকে বেরই হয় না।

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র দিকে তাকালেন তিনি। উত্তরে বললেন, আমীরুল মু’মিনীন! আমার কোনো খাদেম নেই আমার পরিধানের মতো এক জোড়া কাপড়ই আছে মাসে একদিন নিজেই তা ধৌত করি এবং তা শুকানোর জন্য অপেক্ষা করি। আর এভাবে বের হতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের **চতুর্থ** অভিযোগ কি? বললো, প্রায় সে সংজ্ঞাহীন থাকে এর কারণ কি? বললেন, আমি ঐ লোকদের মাঝে ছিলাম যারা মক্কায় খুবাইব ইবনু আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে শূলীতে চড়াতে দেখেছিলাম তখন আমি মুশরিক ছিলাম। কুরাইশরা তার শরীর বর্শার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করছিল আর বলছিল,

اَتُحِبُّ اَنَّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ.

অর্থ : তুমি কি চাও তোমার স্থানে মুহাম্মদ (ﷺ) হোক।

খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

وَاللهِ! مَا اَحَبُّ اَنِّىْ فِىْ اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ شِيْكَ بِشَوْكَةٍ.

অর্থ : আল্লাহর কসম! আমি এও চাই না যে, তাঁর শরীরে কোনো কাঁটা ফুটুক আর আমি আমার পরিবারবর্গের মাঝে আনন্দে থাকি।

ঐ অন্যায় কাজে আমি তখন মুশরিকদেরকে সহযোগিতা করছিলাম। যখন ঐ দৃশ্য আমার চোখের সামনে আসে তখন লজ্জা-শরমে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাই। আমার চিন্তা হতে থাকে যে কিয়ামতের দিন আমার প্রভু আমাকে না জানি জিজ্ঞেস করে ফেলে, হে সা‘ঈদ তুমি কী করেছিলে? আফসোস! আমি যদি ঐ সময় মুসলামান হতাম, খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাহায্য করতাম, কাফিরদেরকে বাধা দিতাম অথবা নিজেও খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সাথে শহীদ হয়ে যেতাম।

‘উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন এ সমস্ত উত্তর শুনলেন তখন বললেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَفْلُ فَرَاسَتِىْ.

অর্থ : আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা আমি যাকে নেতৃত্বের জন্য বাছাই করেছি; সে দুর্বল নয়।

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে আরও এক হাজার দিনার দিলো যাতে করে সে তার ঘরের প্রয়োজন মিটাতে পারে। সা‘ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র স্ত্রী যখন তা দেখল তখন বললো, এ দিয়ে আমরা আমাদের চলাচলের জন্য কোনো যানবাহন এবং খাদেমের ব্যবস্থা করতে পারব।

সা‘ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্ত্রীকে বললো, এর চেয়ে উত্তম জিনিস কেন গ্রহণ করব না? বললো, তা কি? বললো, এগুলো মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাঁর কাছ থেকে এর প্রতিদান নিব। তার নেককার স্ত্রী মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে বললো, ভালো কথা। আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে এর প্রতিদান দিন।

নিজের পরিবারের কোনো একজনকে ডাকল এবং বললো, এ দীনারগুলো নিয়ে গিয়ে অমুক ইয়াতীমকে এত দিবে; অমুক বিধবাকে এত দিবে, অমুক অভাবীকে এত দিবে। এভাবে সম্পূর্ণ টাকা ঐ বৈঠকে শেষ করে দিলো। আল্লাহ তা‘আলা সা‘ঈদ ইবনু ‘আমেরকে উত্তম প্রতিদান দিন –আমিন।[৬৩] ❑

[৬৩] *তারিখ দিমাশক আল কাবীর- ২৩/১১৫; হিলইয়াতুল আউলিয়া- ১/২৪৫-২৪৭।*

কবিতা

সীমাহীন এক সমরের কথা বলছি

মোল্লা মাজেদ*

এক স্বপ্নাতুর বিরহ আত্মার কথা বলছি
স্বপ্নাহত পরাজিত গ্লানির নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত
আহত কিছু সৈনিকের কথা বলছি।
উদ্বিগ্ন মানুষের ব্যথাভরা হৃদয়ের কাতরতা স্পর্শে
বিরামহীন যাতনার অসহ্য যন্ত্রণায়
মানবিক আগুনের প্রজ্বলিত স্ফুলিঙ্গে
ধিক ধিক করে জ্বলছি,
আর সোনালি দিগন্তের মুক্ত আকাশতলে
স্বপ্নিল এই মনে, কলঙ্কিত কীটগুলো
দু'পায়েই দলছি।

ভেতরের দুয়ার খুলে তাকাবার নেই অবসর
কৈফিয়তের তাবেদার হতে পূর্ণতা ছেড়ে
নিভৃতে ঘুরে ঘুরে একাঙ্গেই শুধু চলছি।
চেচনিয়া, আফগান, বসনিয়া ও ফিলিস্তিনের ব্যথায়
উন্মত্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন এক মাতালের মতো টলছি।
আমি চক্রজালে আবর্তিত
সীমাহীন এক সমরের কথা বলছি।

রেডক্রসের লাল ছাতু দাক্ষিণ্য
এবং সম্ভ্রমহীনতার সামগ্রী ভূষণে সজ্জিত নারী,
নিদারুণ শীর্ণ অবয়বে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার
নিক্ষিপ্ত প্লাবনে একাকার ভেসেই চলছি;
সভ্যতার পৃথিবীতে অসভ্য, মানবতাহীন,
জ্যান্ত খবিশ, রক্তলোলুপ
কুলাঙ্গার এক ইনসানের কথাই বলছি।

* *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

কেন পারবো না?

আসিম বিন নূরুল ইসলাম*

কেন পারবো না আমি
সৎ বান্দা হতে,
শয়তান মোরে বাধা দেয়
সহজ-সরল পথে।

কেন পারবো না আমি
রবের প্রিয় হতে,
পারতে হবে তা আমায়
যেতে চাই জান্নাতে।

কেন পারবো না আমি
দ্বীনের দায়ী হতে,
প্রস্তুত হচ্ছি তাই
কঠিন পথে যেতে।

কেন পারবো না আমি
শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে,
মানবতা লিখব তবে
সেবা ছড়িয়ে দিতে।

কেন পারবো না আমি
উজ্জ্বল তাঁরা হতে,
পৃথিবীতে এসেছি তো
আলো রেখে যেতে।

কেন পারবো না আমি
সেরা লেখক হতে,
ভেবে যাই লেখার প্রহরে
বিধির বিধান থেকে।

কেন পারবো না আমি
বড় কবি হতে,
ভেসে যেতে চাই- কাব্য সাগরে
ঈমানী চেতনার রথে।

* *লালমোহন, ভোলা। সানাবিয়া ১ম বর্ষ, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ।*

গাজীপুরে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হজ্জ প্রশিক্ষণ

গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারের রাঁধুনী রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গত ৩ জুন শনিবার এক হজ্জ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে অন্যতম সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী এবং প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল ও আরাফাত সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী, শাইখ আমানুল্লাহ মাদানী, শাইখ ড. রেজাউল করীম মাদানী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রচার সম্পাদক ও রিহাবুল হারামাইন হজ্জ কাফেলার পরিচালক শাইখ মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ গত ৭ জুলাই শুক্রবার কোটচাঁদপুর উপজেলার মল্লিকপুর ও পটুতলা লক্ষীপুরের পাঁচটি মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। এই দা'ওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে জুমু'আর খুৎবাহ্ ও সাংগঠনিক আলোচনা পেশ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ মিকাইল ইসলাম, সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, পশ্চিম লক্ষীপুর তাহফিযুল কুরআন ও দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার হিফ্‌য শিক্ষক মুহাম্মদ আরজুল্লাহ, মল্লিকপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম, জেলা জমঈয়তের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ খালেদ হোসেন প্রমুখ।

পটুতলা কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুউ'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান।

বাদ জুমু'আ পটুতলা শাখা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে ও শাখা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. জিয়াউর রহমানের উপস্থাপনায়, মাস্টার মুহা. আব্দুল আজিজের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জমঈয়তের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, সাপ্তাহিক, মাসিক দরসের ব্যবস্থা, আরাফাত/তর্জুমানুল হাদীসের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য নিয়মিত মাসিক চাঁদা আদায়, যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়রোধে শুব্বানের কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং সকলপ্রকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পতাকাতলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেন।

উপর্যুক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৪ জুলাই শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ সদর উপজেলাধীন পশ্চিম লক্ষীপুর গ্রামের তিনটি মসজিদ সফর করেন। জমঈয়ত ও শুব্বানের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এ সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক আলী ও অধ্যাপক মিকাইল ইসলাম, সেক্রেটারি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (বকুল), তাবলিগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, পশ্চিম লক্ষীপুর তাহফিজুল কুরআন ও দারুল হাদীস মাদ্‌রাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মদ আরজুল্লাহ প্রমুখ। পশ্চিম লক্ষীপুর স্কুল মাঠ আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি। বাদ জুমু'আহ্ পশ্চিম লক্ষীপুর স্কুল মাঠ আহলে হাদীস জামে মসজিদে মুহাম্মদ জামাল হোসেনের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত এবং ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইকরামুল হকের উপস্থাপনায় এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত

হয়। ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ, ইলাকা ও শাখা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় আলোচনার মূল বিষয় ছিল জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর আসন্ন ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩-এ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান। পরিশেষে দু'আর মাধ্যমে দীর্ঘ প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

দক্ষিণ বাংলার জমঈয়ত দরদী মরহুম আলহাজ্জ জামাল উদ্দীন সাহেবের প্রথমা স্ত্রী রহিমা খাতুন গত ৬ই জুলাই রোজ : বৃহস্পতিবার সকাল ৬ ঘটিকার সময় সাতক্ষীরা উপজেলাধীন পাথরঘাটা গ্রামে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল একশত বছরের অধিক। খুলনা যশোর জেলা জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী (রাহিমাহুল্লাহ)'র আমন্ত্রণে ১৯৫২ সালে মরহুম আল্লামা আব্দুল্লাহহিল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ) খুলনা যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠন করার জন্য ঐতিহ্যবাহী পাথরঘাটা গ্রামে আগমন করেন। তার মৃত্যুর পর মরহুম আল্লামা ড. এম.এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ) যতবার সাতক্ষীরায় এসেছেন ততবার পাথরঘাটা গ্রামে পায়ের ধুলি রেখেছেন। আলহাজ্জ মরহুম জামাল উদ্দীন সাহেব ও তাঁর দুই স্ত্রী তাদের খেদমত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এহেন পরহেজগারীতা মরহুমার মৃত্যু সংবাদ শুনামাত্রই সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের সভাপতি এ.এস.এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর ও সেক্রেটারী শাইখ রবিউল ইসলামসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন, শুভাকাঙ্খীরা তার জানাযার সালাত আদায় করার জন্য উপস্থিত হন। বিকাল ৫টার সময় পাথরঘাটা ফুটবল ময়দানে মরহুমার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন মরহুমার নিকট আত্মীয় মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার সাবেক ছাত্র ও বর্তমানে খুলনা আল মাহাদ আস সালাফী মাদ্‌রাসার শিক্ষক হাফেয শাইখ শরীফ হুসাইন মাদানী। সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে আরাফাত পত্রিকার পাঠক পাঠিকাদের নিকট মরহুমার রূহের মাগফিরাতের জন্য দু'আর আবেদন করা হলো।

সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য কতিপয় করণীয় বিষয়

১. ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা জীবনকে সজ্জিত করা এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকা।

২. সর্বদা তাওবাহ্-ইস্তিগফার করা এবং প্রয়োজনীয় দু'আ ও যিক্‌রগুলো পাঠ করা।

৩. 'ইল্‌ম (শরিয়তের জ্ঞান) চর্চা করা। 'ইল্‌ম ছাড়া 'আমল (কর্ম) গোমরাহির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৪. মানুষের উপকার করা ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা। সে ব্যক্তিই সর্বাধিক সেরা যে অন্যের উপকার করে।

৫. বিপদাপদ ও সংকটে মনে সাহস বজায় রাখা।

৬. বিপদাপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা। মনে রাখতে হবে, কোনো কিছুই মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না।

৭. হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ পরায়ণতা থেকে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখা।

৮. সৎলোকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ও অসৎ লোকদের সংস্রব বর্জন করা।

৯. জীবন ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এটিকে বেদনা, কষ্ট, হতাশা দিয়ে ভরে না ফেলে আনন্দময় করে তুলুন। মহান আল্লাহর উপর পরম নির্ভরতা জীবনকে সহজ করে দিবে।

১০. বৈধ পন্থায় চিত্ত বিনোদন করুন। স্ত্রী-পরিবারের সাথে সময় কাটান। হারাম পন্থায় প্রকৃত সুখ নেই। মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি জীবনকে বিষাদময় করে তুলে।

১১. বেশি কথা, বেশি ঘুম, বেশি খাওয়া এবং মনে যা চায় তাই দেখা পরিহার করা। মধ্যম পন্থা অবলম্বন শরীর ও মন উভয়ের জন্য উপকারী।

১২. অতিলোভে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়। অল্পে তুষ্ট ও মিতব্যয়ী জীবন অনেক তৃপ্তিময়।

১৩. পরিচ্ছন্ন পোশাক, সুগন্ধি আর মেদহীন শরীর জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে সহায়ক।

১৪. আপনার জন্য যে কাজটি উপযুক্ত সে কাজটি করুন।

১৫. কর্ম ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে করুন। সকল কাজ সাজিয়ে-গুছিয়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না। অন্যথায় এগুলো আপনার মাথায় দুঃশ্চিন্তা বোঝা হয়ে থাকবে।

[ড. আয়েয আল কারনীর লেখা 'হাদায়েক' গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে, অনুবাদ ও গ্রন্থনায় : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল]

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

অতিরিক্ত ঘাম কেন হয়, করণীয়

ঘাম কিন্তু স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। ঘামের মাধ্যমে শরীর বাড়তি তাপ হারিয়ে শীতল হয়। তাই ঘাম উপকারী। তবে কারও কারও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বা সামান্য পরিশ্রমেও অতিরিক্ত ঘাম হতে দেখা যায়। মানসিক উত্তেজনা, রাগ, ভয়, উদ্বেগের কারণে ঘাম বেড়ে যেতে পারে। অতি উদ্বেগের রোগীদের হাত-পায়ের তালু বেশি ঘামে। রাতে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘেমে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রতি রাতে ঘুমের মধ্যে ঘেমে বিছানা ভিজে যাওয়া, জ্বর জ্বর ভাব, গা ম্যাজম্যাজ থাকলে সাবধান হওয়া উচিত। যক্ষ্মা বা লসিকাগ্রন্থির ক্যানসারে রাতে ঘাম হয়।

ডায়াবেটিস রোগীরা হঠাৎ বিন্দু বিন্দু শীতল ঘামে ঘেমে উঠলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে শর্করা কমে গেছে কিনা সতর্ক হোন। এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, হাত কাঁপুনি থাকতে পারে। এমনটি হলে দ্রুত সহজ শর্করা যেমন চিনির শরবত খেয়ে নিলে সমস্যা মিটে যাবে।

দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিসের রোগীদের স্নায়ুজনতি সমস্যা হলে খাবার সময় বা পরে মাথা, কপাল, ঘাড় বেশি ঘামতে পারে। ঘামের সঙ্গে মাঝে মাঝে বুকব্যথা, বুকে চাপ ধরার মতো সমস্যা হলে অবশ্যই হৃদরোগ আছে কি না নিশ্চিত হওয়া চাই।

আবার থাইরয়েডগ্রন্থির সমস্যায় বেশি ঘাম হয়, তবে এর সঙ্গে ওজন হ্রাস, ডায়রিয়া, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি আরও উপসর্গ থাকে। নারীদের মেনোপজ পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ঘামতে দেখা যায়। একে হটফ্লাশ বলা হয়। হটফ্লাশের সুচিকিৎসা আছে। তাই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো।

অনেক সময় কিছু ওষুধের প্রভাবেও বেশি ঘাম হয়। কারও কারও হতে পারে কফি-চা পান করার পরও।

অতিরিক্ত গরমে বা রোদে বেশি ঘেমে গেলে মাথা ঘোরে, শরীর দুর্বল লাগে, ঝিমঝিম করে। পানি ও লবণ বেরিয়ে যায় বলে এমন লাগে।

তাই বেশি ঘামলে যথেষ্ট পানি, স্যালাইন পানি, ডাবের পানি পান করুন। উদ্বেগজনিত সমস্যা থাকলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হোন। পরীক্ষা বা কোনো দুশ্চিন্তায় বেশি ঘাম, হাত-পায়ের তালু ঘামা উদ্বেগের লক্ষণ। সঙ্গে বুক ধড়ফড়ানি থাকতে পারে।

মনে রাখবেন থাইরয়েড সমস্যায় প্রায় একই ধরনের উপসর্গ হয়। তাই থাইরয়েড হরমোন পরীক্ষা করে নিতে পারেন। স্থূল ও আনফিট ব্যক্তিরা সহজেই অল্প পরিশ্রমে ঘেমে ওঠেন। ফিট থাকার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করুন। যারা বেশি ঘামেন তারা চা-কফি কম পান করবেন। কোনো ওষুধ থেকে হচ্ছে কিনা খেয়াল করুন। জ্বর আছে কি না তাই মেপে দেখুন। শিশুরা একটু বেশিই ঘামে। তাদের বেশি কাপড় পরাবেন না। *[সূত্র : যুগান্তর অনলাইন]*

অতিরিক্ত ঘাম, যেসব বড় অসুখের লক্ষণ হতে পারে

গরমের এ সময়টাতে ঘামের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তাই অনেকেই অতিরিক্ত ঘাম হওয়াটাকে তেমন গুরুত্ব সহকারে দেখেন না। কিন্তু এই অতিরিক্ত ঘামের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের না করলে আপনি পড়তে পারেন মারাত্মক বিপদের মুখে। কেননা অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে জটিল কিছু রোগের।

ভারতের অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সিনিয়র ইন্টারভেনশন্যাল কার্ডিওলজিস্ট ডা. বিকাশ মজুমদার মনে করেন, বেশকিছু বড় অসুখের পূর্বলক্ষণ হলো অতিরিক্ত ঘাম।

তাই অতিরিক্ত ঘামের লক্ষণটিকে গুরুত্ব না দিলে পরিবারের কোনো সদস্যের অনাকাঙ্ক্ষিত আকস্মিক দুঃসংবাদ পেতে পারেন আপনি। নিজেও পড়তে পারেন বিপাকে। তাই ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনে প্রকাশিত হওয়া একটি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী আসুন জেনে নিই অতিরিক্ত ঘামের সঙ্গে কোন কোন জটিল রোগগুলো সম্পর্কিত রয়েছে।

হৃদরোগ : হার্টের কোনো সমস্যা হলে আপনার অবশ্যই অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা দেখা দেবে। ঘামের সঙ্গে উপসর্গ হিসেবে থাকতে পারে বুক ধড়ফড়, বুকে ব্যথা, কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং বুকে চাপ অনুভব ও শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। হার্টের গতি কম বা বেশি হলে কিংবা হার্টে ব্লক থাকলে আপনার শরীরে মাত্রাতিরিক্ত ঘাম হবে।

ডায়াবেটিস : অতিরিক্ত ঘামের সঙ্গে ডায়াবেটিস রোগটিরও সম্পর্ক আছে। ডায়াবেটিস রোগীদের হঠাৎ ব্লাডসুগার কমে গেলে শরীরে অস্বস্তির সঙ্গে প্রচুর ঘামের সৃষ্টি হয়।

থাইরয়েড : থাইরয়েডের ভারসাম্যহীনতার কারণে বেশি ঘাম হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাইপার থাইরয়েডের জন্য মানুষের শরীরে থাইরয়েড হরমোনের ক্ষরণ বেশি হয়, ফলে রোগীর খিদে বেড়ে যায়। কিন্তু ওজন কমতে থাকে। সেইসঙ্গে বেড়ে যায় মাত্রারিক্ত ঘামের প্রবণতাও।

ব্রেন স্ট্রোক : হঠাৎ মাথার যন্ত্রণা, শরীরে প্যারালাইসিসের মতো অনুভূতি কিংবা স্ট্রোকের পূর্বে বেশ কয়েকদিন আপনার প্রচুর ঘাম হতে পারে।

নিউরোলজিক্যাল সমস্যা : মাথায় টিউমার, খিচুঁনির মতো যেকোনো নিউরোলজিক্যাল সমস্যার প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে আপনার। তাই সঠিক সময়ে অতিরিক্ত ঘামের কারণ খুঁজে বের করতে পারলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে গুরুতর শারীরিক ক্ষতির থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন চিকিৎসকরা।

টেনশন ও ভয় : শরীরে কোনও স্ট্রেস, টেনশন বা ভয়ের কারণ হলে অ্যাড্রিনালিন ও নন্-অ্যাড্রিনালিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে গিয়ে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম সক্রিয় হয়ে যায় এবং ঘামের সৃষ্টি করে।

রক্তে ইনফেকশন : যদি আপনার রক্তে ইনফেকশনের সমস্যা থাকে, তবে তা আপনার শরীরকে প্রায়ই উত্তপ্ত করে তুলবে। এ সমস্যায় আপনার ব্লাড প্রেশার অনেকটাই কমে যাবে। এ সমস্যায় হার্ট চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত রক্ত পাম্প করে শরীরকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে রোগীর দেহ ঠাণ্ডা হয়ে প্রচণ্ডমাত্রায় ঘাম বা শীতল ঘাম নির্গত হয়, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। *[সূত্র : সময় টেলিভিশন অনলাইন]*

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাড়ায় যেসব রোগের ঝুঁকি

যেকোনো সম্পর্কেই সমস্যা হতে পারে। মজার বিষয় হলো, সবচেয়ে কাছের মানুষের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ঝগড়া হয়। কাছেই আমাদের প্রত্যাশা থাকে বেশি। যেমন ঘটে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

একটি সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য মাঝে মাঝে একটু হলেও ঝগড়ার প্রয়োজন আছে। এতে পরস্পরের মনের ক্ষোভগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। এদিকে মনোবিদরা বলছেন, ঝগড়ার সময় এমন কোনো কথা বলা যাবে না যাতে সম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে যায়।

তবে প্রায়ই ঝগড়ার প্রবণতা কিন্তু সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, এমনকি কঠিন ব্যাধি যেমন হৃদরোগ থেকে মৃত্যুঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে দম্পতির মধ্যে।

উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে : চাপযুক্ত সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। ২০১৬ সালের এক সমীক্ষায় মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেন, বিবাহিতদের মধ্যে দাম্পত্য রেষারেষি ও নিত্যকলহের কারণে পুরুষদের মধ্যে রক্তচাপ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে নারীদের রক্তচাপও বাড়তে পারে তবে পুরুষের চেয়ে কম।

মানসিক অবসাদ বাড়ে : দাম্পত্যজীবন বিষাক্ত হয়ে উঠলে তা দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসের কারণ হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী চাপ মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস ইমিউন সিস্টেমের স্বাস্থ্য, থাইরয়েড ও মেজাজের ব্যাধির ঝুঁকি বাড়ায়।

প্রদাহ বাড়ে : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ শরীরে উচ্চ মাত্রার প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। হার্ভার্ড হেলথের মতে, মানসিক উত্তেজনার কারণে শরীরে প্রদাহের মাত্রা বাড়তে পারে। যা ক্রমেই গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে।

সাইকোলজিক্যাল বুলেটিন জার্নালে প্রকাশিত ২০১৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, স্ট্রেস উল্লেখযোগ্যভাবে ইমিউন সিস্টেমকে পরিবর্তন করে ও প্রদাহ বাড়ায়।

বিষণ্নতা বাড়ে : দাম্পত্যজীবন ভালো না থাকলে যে কারো বাড়বে বিষণ্নতার ঝুঁকি। মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশনের গবেষণায় উঠে এসেছে, একটি বিষাক্ত সম্পর্কে থাকার চেয়ে অবিবাহিত হওয়া ভালো। গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিকভাবে কোনো মানুষ প্রত্যাখ্যাত হলে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের (এমডিডি) ঝুঁকি বেড়ে যায়। দাম্পত্যে অশান্তি কিংবা বিচ্ছেদের কারণেও মানসিক এই সমস্যায় ভুগতে পারেন যে কেউ।

আয়ুও কমে যেতে পারে : দীর্ঘমেয়াদি দাম্পত্যে অশান্তি আয়ুও কমিয়ে দিতে পারে। দাম্পত্যে সুখী থাকলে যেমন আয়ু বাড়ে ঠিক তেমনই এর উল্টোটি ঘটে একটি বিষাক্ত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবন কাটালে। মানসিক চাপ মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন করে দেয়। ফলে অস্বাস্থ্যকর খাওয়া, মাদকাসক্ত, কম ঘুম, মানসিক চাপ ইত্যাদি শারীরিক বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। ২০১৬ সালে প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের রিপোর্ট করা এক সমীক্ষায় জানা যায়, সামাজিক সম্পর্ক ও মৃত্যুহারের মধ্যে সম্পর্ক আছে। সামাজিক চাপের সম্মুখীন ব্যক্তিদের মধ্যে

বয়স বাড়তেই স্ট্রেসসম্পর্কিত রোগ ও প্রদাহের ঝুঁকি বেশি। যা অকাল মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

ওজন বেড়ে যায় : সাইকোলজি টুডেতে প্রকাশিত এক সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে, যারা ব্যক্তিগত জীবনে খুশি নন কিংবা দাম্পত্য কলহের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। ফলে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো স্থূলতা-সম্পর্কিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। গবেষকরা ১১ বছর ধরে ৮০০০ মানুষের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য জানান।

হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে : তিক্ত সম্পর্কের কারণে হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ে। দ্য জার্নাল অব জেরোন্টোলজি : সিরিজ বি'তে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, মানসিক চাপ রক্তচাপ বাড়ায়, যা অনেক গবেষণায় দেখা গেছে। দীর্ঘদিন এই সমস্যায় ভুগলে তা হৃদরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া মানসিক চাপের কারণে শারীরিক আরো যেসব লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলো হলো– মাথা ঘোরা, শরীর ব্যথা ও যন্ত্রণা, মাথা ব্যথা, পেশিতে টান, ঘুমের সমস্যা, হার্টবিট বেড়ে যাওয়া, চরম ক্লান্তি, পেট খারাপ কিংবা কাঁপুনি। *[সূত্র : কালের কণ্ঠ]*

উচ্চ রক্তচাপ, ইউরিক অ্যাসিড, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী এ ভেষজ

দীর্ঘমেয়াদি অসুখ উচ্চ রক্তচাপ, ইউরিক অ্যাসিড, ডায়াবেটিসের মতো জটিল রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে একটি ভেষজ উপাদান। আর এটির নাম মেথি।

নিয়মিত মেথি ভেজানো পানি অথবা চা সেবনে ডায়াবেটিসের পাশাপাশি বদহজম, দুশ্চিন্তা, কোষ্ঠকাঠিন্যর মতো রোগকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ঘরেই উচ্চ রক্তচাপ, ইউরিক অ্যাসিড, ডায়াবেটিসের রোগী রয়েছে। সাধারণত এই রোগের শিকার হলে রোগীকে সারা জীবন এ অসুখ বয়ে বেড়াতে হয়। রোগীকে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেক কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। পাশাপাশি সেবন করতে হয় ওষুধও।

কিন্তু ওষুধের মাত্রা কমিয়ে লাইফস্টাইলে পরিবর্তন এনে আর ডায়েটে ভেষজ উপাদান মেথিকে যুক্ত করে সহজেই এ সমস্যা থেকে কার্যকরী সমাধান খুঁজে পেতে পারেন আপনি।

মেথি সাধারণত রান্নায় পাঁচফোড়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে নানা ভেষজ গুণ সম্পর্কে।

মেথিতে রয়েছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ। এছাড়াও রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টস এবং অ্যান্টি ইনফ্লুযামেটরির মতো উপাদান। ভেষজ ওষুধ হিসেবে পিরিয়ড ক্র্যাম্প, স্ট্রোক, বর্ধিত প্রোস্টেট এবং মুটিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। বর্ষজীবী এই উদ্ভিদের রয়েছে রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি করার মতো প্রাকৃতিক ক্ষমতাও।

যাদের কৃমির সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং সদ্য মা হয়েছেন এমন নারীর ক্ষেত্রে মেথি ভালো কাজে আসে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায় মেথি সেবনে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর ভিটামিন অ্যান্ড নিউট্রিশন রিসার্চ-এ প্রকাশ হওয়া প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, নিয়মিত পথ্য হিসেবে মেথি সেবনে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে। রক্তে চিনি, কোলেস্টেরল আর চর্বির মাত্রা কমতে শুরু করে।

মেথিতে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিয়মিত ১০ গ্রাম মেথি গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে সে পানি পান করলে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে।

এই সমীক্ষায় ৩০টি দেশের ২৫ হাজার পুরুষ অংশগ্রহণ করে। যারা সবাই দিনে ২ বার মেথির পানীয় সেবন করেছিল। ফলাফল হিসেবে গবেষকরা যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছিল সেটি হলো মেথির রসে সাপোনিস বা ডাইওসজেনিন নামে এক ধরনের যৌগ পদার্থ আছে, যা মানবদেহের হরমোন স্তরকে বাড়িয়ে তোলে।

এছাড়া চুল পড়া, চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়া, ত্বকের বিভিন্ন ক্ষত, কালো দাগ, মুখের ব্রণ, ফুসকুড়ির মতো নানা ধরনের সমস্যাতেও মেথির উপকারিতা রয়েছে।

মেথির এসব উপকারিতা পেতে ১০ গ্রাম মেথি ১ গ্লাস গরম পানিতে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে তা ঠাণ্ডা করে সেবন করতে পারেন। কিংবা আদা, দারুচিনি দিয়ে মেথির চা তৈরি করেও নিয়মিত তা পান করে ৩ মাসের মধ্যেই এর জাদুকরী ক্ষমতা উপভোগ করুন। *[সূত্র : সময় টেলিভিশন অনলাইন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার নিজস্ব পুঁজি ৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু ব্যাংক ঋণ কয়েক কোটি টাকা। এখন আমার প্রশ্ন হলো– এই ঋণের বোঝা নিয়েও কি আমাকে যাকাত দিতে হবে এবং কিভাবে তা আদায় করতে হবে?*

নূর ইসলাম

সপুরা, রাজশাহী।

জবাব : ইসলামি শরিয়তের মাপকাঠিতে ঋণগ্রস্ত বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যে অভাবের তাড়নায় কিংবা মুসলিমদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য কারো খুনের জামিন হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পদ পেলে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে। কেননা, এটি বান্দার হক্ব। আর যাকাত হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্ধারিত হক্ব। এ ক্ষেত্রে বান্দাহর হক্ব আগে পরিশোধ করতে হবে; যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু আপনার জিজ্ঞাসা মতে বুঝা যাচ্ছে যে, আপনার নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা রয়েছে, যা আপনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। এ ব্যবসাকে আরো বড়ো করার জন্য আপনি সুদের উপর ব্যাংক লোন নিয়ে কয়েক কোটি টাকার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অতিরিক্ত এ বোঝার জন্য আপনিই দায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহ কারোর উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না"– *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬)*। আপনি অতি মুনাফার লোভে ব্যাংক ঋণে দায়গ্রস্ত। আর যেহেতু নেসাব পরিমাণ সম্পদ আপনার আছে, তাই আপনাকে যথাসম্ভব হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং ব্যাংক লোন পরিশোধের চেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : *জনৈক আলেম বলেছেন, কেউ যদি এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়, তবে তা তিন তালাক বলে গণ্য হবে। কিন্তু বিচ্ছেদ তিন মাস পর কার্যকর হবে। আর এটা না কি ইমাম চতুষ্টয়ের ফাতাওয়া। বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।*

আব্দুল মাজীদ

মহাস্থান, বগুড়া।

জবাব : এটি বিরোধপূর্ণ মাস'আলা। আর এ ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ফায়সালা কী তা জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতকাল এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতের প্রথম ২/৩ বছর এক বৈঠকে প্রদত্ত তিন তালাককে কেবল একটিমাত্র তালাক গণ্য করা হতো– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৭২)*। কাজেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফায়সালাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান করাই ঈমানের দাবী। আর পবিত্র অবস্থায় দেওয়া তালাক সাথে সাথেই কার্যকর হয়ে যায়। তবে ফেরত নিতে চাইলে ঋতুর আগেই ফেরত নিতে হবে। এভাবে দু'বার ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

"তালাক্ব দুই দফা, অতঃপর ভালোভাবে পুনঃগ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান..."– *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২২৯)*। অর্থাৎ- এক তুহুরে একটি তালাক্ব দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। এরূপ দু'বার করার সুযোগ থাকবে– *(আত্ ত্বাবারী 'জামি'উল বায়ান'- ৪/১২৫)*। যদি কোনো ব্যক্তি সুন্নাহ মোতাবেক দুই তালাক দেওয়ার পর ঋতুর পূর্বে তার স্ত্রীকে ফেরত না নেন, তাহলে ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তবে চাইলে সে নতুন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাকে ফেরত নিতে পারবে। আর যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে ফেলে, তাহলে এটি অকাট্য তালাক বলে গণ্য হবে। তখন আর তাকে ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। তবে ঐ মহিলার বিয়ে অন্য জায়গায় বিবাহ হলে এবং ঘর-সংসার করার পর কোনো কারণে তালাক

দিলে কিংবা ঐ স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালনের পর চাইলে প্রথম স্বামী আবার বিয়ে করতে পারবে– *(সূরা আল বাক্বারাহ : ২৩০)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমার পৃথক দু'টি একাউন্টে নিসাব পরিমাণ টাকা জমা আছে। যার একটির বছর পূর্ণ হয় মার্চ মাসে এবং অন্যটির বছর পূর্ণ হয় নভেম্বর মাসে। এখন আমি কীভাবে যাকাত আদায় করব? নভেম্বর মাসে উভয় টাকার যাকাত এক সাথে দেবো, না-কি বছর পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে পৃথকভাবে দেবো।***

মশিউর রহমান
নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

জবাব : আপনি যেহেতু দু'টি একাউন্টের মালিক, সেহেতু যে মাসে গিয়ে আপনার দুই হিসাব মিলে নেসাব তথা ৮৬ গ্রাম স্বর্ণের সমমূল্য পরিমাণ হবে তখন থেকেই আপনার বছর গণনা শুরু হবে। আর সে আলোকে বছর পূর্ণ হলেই আপনার উপর যাকাত ফর্‌য হয়ে যাবে– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫৭৩)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***ওয়াজের ময়দানে বক্তাগণ সমাজের শীর্ষ নেতা ও ব্যক্তিদের সম্মুখে তাদের ভূয়সি প্রশংসা করেন। এক ব্যক্তি বলেছেন, এটা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও ব্যক্তিপূজার নামান্তর। তিনি কি সঠিক বলেছেন?***

মো. কাদেরুজ্জামান
ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : কারো সামনে তার প্রশংসা করা নিন্দনীয়। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এক প্রকার চাটুকারিতা এবং তোষণ নীতির অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে এরূপ বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। এরূপ কাজ তখনই ব্যক্তি পূজা বলে গণ্য হবে, যখন কোনো নেতার নির্দেশকে আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর হুকুমের উপর প্রধান্য দেবে। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইবনু হাতেম বলেন : আমার গলায় স্বর্ণের ক্রোশ পরিহিত অবস্থায় আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট গমন করলাম। তখন নবী (ﷺ) বলেন :

فَقَالَ : «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ»، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٌ : ﴿اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ﴾ (التوبة : ٣١)، قَالَ : «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ».

হে আদি! তোমাথেকে এ মূর্তিটা সরিয়ে ফেলো। আর তিনি সূরা আল বারাআহ্ তথা তাওবাহ্ (৩১ নং আয়াত) পড়ছিলেন– "তারা (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম-উলামাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" তিনি বলেন : তারা ওদের 'ইবাদত করতো না; তবে তারা কোনো কিছুকে হালাল বললে তা হালাল করে নিতো এবং কোনো কিছুকে হারাম করলে তা হারাম বলেই জানতো"– *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩০৯৫, হাসান)*। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) তার 'হাক্বীক্বাতুল ঈমানী ওয়াল ইসলামি' গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এভাবে হালাল-হারাম স্থির করাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওদের আলেমগণের 'ইবাদত বলে উল্লেখ করেন– *(প্রাগুক্ত- ১১১)*। উপরোক্ত দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো নেতার কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর প্রাধান্য দিলে সেটি ব্যক্তি পূজায় পরিণত হবে; নতুবা শুধু প্রশংসা করলে তা ব্যক্তি পুজা বলা যাবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***যে অন্যায় করে আর যে ব্যক্তি অন্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে, উভয়ে সমান অপরাধী। এটি কি কুরআন সুন্নাহ সম্মত কোনো কথা এবং উভয়ের শাস্তি কি সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে?***

মো. আব্দুল্লাহ
ময়মনসিংহ সদর।

জবাব : অন্যায় কাজের শ্রেণিভেদ রয়েছে। এর ধরন-প্রকৃতি বিচাব-বিশ্লেষণ করে শর'ঈ হুকুম নির্ধারণ হবে। অন্যায় কাজে সমর্থন বা সহযোগিতা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"আর তোমরা গোনাহ ও সীমালঙ্ঘন কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না"– *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ২)*। পাপ কাজে সমর্থন বা সহায়তা করলে পাপীর সমান পাপের বোঝা সহায়তাকারীর উপর বর্তাবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ.

"আর যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর দিকে আহ্বান করবে, তার উপর সেরূপ পাপ বর্তাবে যারা তার অনুসরণ করবে"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭৪)*। অর্থাৎ- যে লোকের ডাকে বা সহায়তায় যত লোক গোমরাহীর কাজ করে যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে, তাদের সকলের পাপসম বোঝা ঐ লোকের উপর পড়বে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ﴾

"যার ফলে কিয়মত দিবসে তারা বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায়, আর তাদেরও পাপের বোঝা বহন করবে, যাদেরকে তারা গোমরাহ করেছে অজ্ঞতাবশত। হায়, তারা যা বহন করবে, তা কতইনা নিকৃষ্ট"– *(সূরা আন্ নাহ্‌ল : ২৫)*। তাছাড়া অন্যায়কারীর শাস্তি নিশ্চিত করার বেলায় দয়া দেখাতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

"যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি তোমাদের দয়ামায়া যেন কাজ না করে"– *(সূরা আন্ নূর : ০২)*। অতএব, আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে-আমরা কোনো অন্যায় করবো না এবং কোনো অন্যায়কারীকে সমর্থন করবো না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমাদের সমাজে অনেকেই দ্বিতীয় বিবাহ করার পর তা গোপন রাখে। পরবর্তীতে জানাজানি হওয়ার পর তখন তা প্রকাশ করে। আমার প্রশ্ন হলো– বিবাহ করে গোপন করা কি শরিয়তসম্মত কাজ?

মোজাম্মেল হক
চক বাজার, ঢাকা।

জবাব : বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। যে জন্য তা সমাজে জানাজানি হওয়া এবং আক্বদের সময় ২জন পুরুষ সাক্ষী রাখাকে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ».

"তোমরা এ বিবাহকে জনসম্মুখে প্রকাশ করো..."– *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৪৯, মা. শা., হা. ১৮৯৫; জামে' আত্ তিরমিযী- মা. শা., হা. ১০৮৯)*। অর্থাৎ- শরিয়তসম্মত বিবাহ একটি উত্তম কাজ। তা পরস্পর জানাজানির মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। এটিতো কোনো পাপ কাজ নয়। লুকোচুরি তো যিনা-ব্যভিচারের বেলায় হয়ে থাকে। তাই পবিত্র বিবাহকে সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা উচিত। ইসলামী শরিয়তের সকল শর্ত মেনে যদি বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং বিশেষ কোনো কারণে সাময়িক সময়ের জন্য কোনো কোনো ব্যক্তি থেকে তা গোপন রাখা হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : আমি পাখি খুব পছন্দ করি। আমি কি খাঁচায় বন্দি করে পাখি পালন করতে পারব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

মো. সাইফুল্লাহ
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

জবাব : পাখি মহান আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। এ রূপ পাখিকে পছন্দ করা দোষের নয়। তবে খাঁচায় বন্দি করে রাখায় তার স্বাধীনভাবে প্রাপ্য অধিকার তথা খাদ্য-পানীয় ও উন্মুক্ত বাতাস গ্রহণে বাধা না হলে খাঁচায় বন্দি করে লালন-পালন করা জায়িয। এ মর্মে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়ে যে, আবূ 'উমায়ের একটি পাখি পুষতেন যার নাম ছিল 'আল-নুগায়ের'। সে পাখিটি মারা গেলে বালক চিন্তিত হয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বালকটিকে স্ফূর্তিচ্ছলে বললেন : হে আবূ 'উমায়ের! তোমার আল-নুগায়ের পাখি কি করলো?– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৭৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২১৫০)*। এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ইমাম ইবনু হাজর আল-আসক্বালানী (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন : খাঁচায় আটকিয়ে পাখি পালা জায়িয– *(ফাতহুল বারী- ১০/৫৪৮)*। শাইখ বিন বায (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب؛ لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل، ولا دليل على خلاف ذلك فيما نعلم.

"খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করে দিলে এভাবে খাঁচায় বন্দি করে পাখি লালন-পালনে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এ মাসআলার মূল হলো হালাল। আমাদের জানা মতে এর পিরীত কোনো দলিল নেই"– *(ফাতওয়া উলামাউল বালাদিল হারাম- ১৭৯৩)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : আমার মনে আল্লাহভীতি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অলসতাবশতঃ অনেক সময় নামায ছেড়ে দিই এবং এ জন্য মনের মধ্যে অনুশোচনা কাজ করে। এই অনুশোচনা কি আমার ক্ষমার জন্য যথেষ্ট হবে?

ফারহানা ইসলাম
পাকশি, পাবনা।

জবাব : অলসতবশতঃ সালাত ছেড়ে দেওয়া কুফ্‌রী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

"যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিলো, সে কুফ্‌রী করলো।"[৬৪]
আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফেল না করে। যারা এরূপ করবে, তারা খতিগ্রস্ত"– *(সূরা আল মুনা-ফিকূন : ০৯)*। জ্ঞাতসারে যেসব সালাত ক্বাযা হয়েছে, তা আদায় করে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। শুধুমাত্র অনুশোচনা এ অপরাধ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অজানা ক্বাযা-এর জন্য খালেস নিয়তে তাওবাহ্ করলে আশা করা যায়- আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : *তাহিয়্যাতুল ওযূ ও দুখুলল মসজিদ এই সালাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।*

নূর ইসলাম
সপুরা, রাজশাহী।

জবাব : তাহিয়্যাতুল ওযূ হচ্ছে ওযূ করার পর ২ রাকআত সালাত আদায় করা। এটি ফযীলতপূর্ণ একটি 'আমল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَن تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هذا ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيْهِما نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

"যে আমার এ ওযূর মতো ওযূ করবে অতঃপর মনে মনে কোনো আলোচনা না করে ২ রাকআত সালাত আদায় করবে, তার অতীতের গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২২৬)*

আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ হচ্ছে মসজিদে প্রবেশ করার পর ২ রাকআত সালাত আদায় করে বসা। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, এই সালাত পড়ে মসজিদে বসতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। তিনি (ﷺ) বলেন :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বে ২ রাকআত সালাত আদায় করে"– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৪)*। এ দু'রাকআত সালাত মসজিদের আদবের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেউ বিনা সালাতে মসজিদে বসলে সে আদবের খেলাফ করবে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ অমান্য করার দায়ে দায়ী হবে। লক্ষ্যণীয় যে, জুমু'আর খুৎবাহ্ চলাকালে সাধারণতঃ সালাত আদায় নিষেধ। কিন্তু মসজিদে প্রবেশের আদবস্বরূপ অন্ততঃ ২ রাকআত সালাত আদায় করা অতি গুরুত্ববহ, বিধায় খুৎবাহ্ চলাকালে একজন সাহাবী বসে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে দাঁড় করিয়ে ২ রাকআত সালাত আদায় করালেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৩০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৮৭৫)*। এতে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তাহিয়্যাতুল ওযূর সাথে মসজিদ শর্ত নয়। যখন যেখানে ওযূ করবে তখন সেখানে চাইলে ২ রাকআত সালাত আদায় করবে। পক্ষান্তরে তাহিয়্যাতুল মসজিদ ২ রাকআত সালাত, যা মজজিদে প্রবেশ করে বসতে চাইলে আদায় করা শর্ত। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : *আমি বিয়ে করেছি মাত্র ছয় মাস হয়েছে। হঠাৎ আমার বিদেশে যাওয়ার ভিসা এসেছে। যেহেতু কাজের উদ্দেশে বিদেশে গমন করছি, সেহেতু ৪/৫ বছরের আগে দেশে ফেরার সম্ভাবনা নেই। এখন আমার করণীয় কী?*

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : বিয়ে করে স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। কোনো কারণে স্বামী বাইরে গেলে কারণ শেষ হওয়া মাত্র ঘরে ফিরার নির্দেশ রয়েছে। স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সর্বোচ্চ ৬ মাস স্বামী দূরে থাকতে পারবে। এর বেশি থাকতে চাইলে স্ত্রীর অনুমতি লাগবে। তার ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরতঃ অনুমতি সাপেক্ষে ৬ মাসের বেশি দূরে থাকাতে কোনো দোষ নেই– *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া- ২১২)*। আপনি যেহেতু কয়েক বছরের জন্য বিদেশ গমন করতে যাচ্ছেন, সেহেতু স্ত্রীর সম্মতি আবশ্যক। যদি সে সম্মত হয়, তাহলে ভালো। আর সম্মত না হলে আপনার বিবাহ বন্ধনে তাকে আটকে রেখে একাকী ফেলে যাওয়া জায়িয নয়– *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৯০৯)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : *আমি ফ্লাট ক্রয়ের উদ্দেশে প্রতি মাসে একটা এমাউন্ট ব্যাংকে জমা করি। ফ্লাট ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাতে হয়তো আরো ৩/৪ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো– এই জমাকৃত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি? এবং ঐ টাকা দিয়ে কি আমাকে হজ্জ সম্পাদন করতে হবে?*

আব্দুল আওয়াল
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

জবাব : বসবাসের জন্য বাড়ি নির্মাণ বা ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ সঞ্চয় করলে তার যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি ভাড়ার

[64] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬২১, সহীহ।

জন্য ফ্লাট ক্রয় করতে চান এবং এ জন্য অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহলে নেসাব পরিমাণ তথা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ সমমূল্যের অর্থ জমা হয়ে একবছর অতিবাহিত হলে সে অর্থের উপর যাকাত ফর্‌য হয়ে যাবে– ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫৭৩)***। যদি আপনার বসবাসের জায়গা থাকে এবং অতিরিক্ত ফ্ল্যাট ক্রয়ের নিয়তে অর্থ জমা করেন, তাহলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনপূর্বক সে সঞ্চিত টাকা দিয়ে আপনি হজ্জ করতে পারবেন; বরং বিলাসী স্বপ্ন বাদ দিয়ে আপনার হজ্জে যাওয়াই আশ্যক। নতুবা সামর্থ্য থাকার পর পবিত্র হজ্জ না করার দায়ে আপনাকে দায়ী হতে হবে– ***(সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৯৮)***। –ওয়াল্লাহু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : বর্ষ বরণে ইসলামি বিধান কী? হিজরী বর্ষবরণ করা বা এ উপলক্ষ্যে কাউকে শুভেচ্ছা জানানো সম্পর্কে জানতে চাই।

মোস্তফা কামাল
চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

জবাব : বর্ষবরণ ইসলাম সমর্থন করে না। এটি অমুসলিদের সংস্কৃতি। আর অমুসলিম কাল্‌চারের সাদৃশ্যতা অপরিনামদর্শী। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেন :

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

“যে যে জাতির অনুসরণ বা সাদৃশ্য পোষণ করবে, সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে”– ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪০৩১)***। আমাদের জীবন থেকে একটি বছর অতিবাহিত হলে আমরা সে জন্য আত্মসমালোচনা করবো এবং ভুল-ভ্রান্তির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। আর নতুন বছরের ভালো কাজের সংকল্প করবো। এর চেয়ে বেশি কিছু করা শরিয়তসম্মত হবে না। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (১৩) : যে ব্যক্তি মরণোত্তর চক্ষু দান করবে সে কিয়ামতে অন্ধ হয়ে উঠবে। এ কথার সত্যতা কতটুকু? দয়া করে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

আব্দুল ফাত্তাহ
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন। মানুষের দেহ ও প্রাণ মহান আল্লাহর নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

“আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঢেলে দিও না!”– ***(সূরা আল বাক্বারাহ : ১৯৫)***। মানুষের দেহের অংশ বিশেষ দান দু’ভাবে হয়ে থাকে। **এক-** জীবিত অবস্থায় দান করা। **দুই-** মৃত্যুর পর কার্যকর হবে মর্মে দান করা। জীবিত অবস্থায় মানুষের উপকারার্থে এমন অংশ দান করা যাবে, যা দিলে দাতার জীবনের জন্য কোনো আশঙ্কা দেখা দেবে না। তবে মরণোত্তর চক্ষু বা অনুরূপ কোনো অঙ্গ যদি দাতা সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিস্কে কোনোরূপ বিনিময় ছাড়া মানুষের কল্যাণার্থে দান করার ওসীয়ত করলে সেটি তার স্বাভাবিক মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর গ্রহণ করা যাবে বলে বিজ্ঞ আলেমগণের ফাতওয়া রয়েছে। কিন্তু “মরণোত্তর চক্ষু দানকারী কিয়ামতে অন্ধ হয়ে ওঠবে” মর্মে কোনো হাদীস নেই। এটি সমাজে প্রচলিত ভিত্তিহীন কথা। –ওয়াল্লা-হু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (১৪) : সূরা আল আ‘লা ও আল গা-শিয়াহ্ আমরা জুমু‘আর দিন পড়ে থাকি। এ দু’টি সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আবু আব্দুল্লাহ
হরিপুর, সিলেট।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুমু‘আহ্ ও ঈদের সালাতে সূরা আল ফাতিহাহ্’র পর প্রথম রাকআতে সূরা আল আ‘লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল গা-শিয়াহ্ পড়েছেন– ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৮৭৮)***। সূরা আল আ‘লা অবতীর্ণ হওয়ার কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে সহীহুল বুখারীতে যে হাদীসটি রয়েছে, তাকে কেউ কেউ অত্র সূরাটির অবতরণের প্রেক্ষাপট বলে অভিহিত করেছেন। হাদীসটি বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় না যে, এটি সূরা আল আ‘লা নাযিল হওয়ার কারণ বুঝায়। হাদীসটি নিম্নরূপ :

...ثُمَّ "قَدِمَ النَّبِيُّ (ﷺ)، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ (ﷺ)، حَتّٰى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلْنَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ)، فَمَا قَدِمَ حَتّٰى قَرَأْتُ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.

“... নবী (ﷺ) আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমনে মদীনাবাসী যেভাবে আনন্দিত হয়েছিল, অন্য কিছুতে তাদের সেরূপ আনন্দ আমি দেখিনি। এমনকি মহিলারা বলতে লাগলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আগমন করেছেন। তিনি আসতেই আমি ‘সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা’ পাঠ করলাম”– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯২৫)***। উপরোক্ত বাক্য দ্বারা সূরাটি পাঠ করার কথা বুঝা যায়; নাযিল হওয়ার কথা নয়। অতএব, এটি স্পষ্ট করে বলার কোনো সুযোগ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মদীনা আগমনের প্রেক্ষিতে অত্র সূরাটি নাযিল হয়েছে।

অনুরূপভাবে 'সূরা আল গা-শিয়াহ্' নাযিল হওয়ার কারণ বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় না। সূরাটির অর্থ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***আমি যদি আমার পুত্র ও কন্যা সন্তানদের নামে জমি ক্রয় করতে চাই তবে কি তা ২:১ পদ্ধতিতে ক্রয় করতে হবে? না-কি উভয়কে সমপরিমাণ দেওয়া যাবে?***

হাসনাত আব্দুল্লাহ
জগতি, কুষ্টিয়া।

জবাব : আপনি নিজ নামে সম্পদ ক্রয় করবেন। আর আপনার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ হিসেবে তারা প্রত্যেকে ২:১ ভিত্তিতে অংশ পাবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সন্তানদের মৌলিক চাহিদ যেমন-ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সাধারণ কোনো কিছু হাদিয়া করতে চাইলে ছেলে-মেয়ে সকলকে সমপরিমাণ হারে দিতে হবে; সন্তানদের মাঝে কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো"– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ২৫৮৭ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৬২৩)***। স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে কিংবা নিজের জায়গা-জমি সন্তানদের নামে দেওয়া ঠিক নয়। কেননা, এটি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত অংশ, যা আপনার মৃত্যুর পর সন্তানরা ওয়ারিশ হিসেবে পাবে। সন্তানদের কামাই করা টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করে দিলে যার যে রকম অর্জন, ঠিক সে হারে তাদের নামে দিতে হবে। তবে নিজের অর্থ দিয়ে দিলে সে ক্ষেত্রে সন্তানরা শর'ঈ বিধান মতো যে যতটুকু অংশ পাবে, কোনোরূপ বে-ইনসাফি না করে ততোটুকু ক্রয় করে দেবেন। কন্যা সন্তানকে বা অন্য কোনো ছেলেকে তার অংশ হতে কম-বেশ করবেন না। সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ বলতে এটাকেই বুঝানো হয়েছে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৬) : কেউ যদি ইসলামের কোনো হুকুম নিয়ে কটূক্তি করে তবে কি সে কাফির বলে গণ্য হবে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

নুরুল ইসলাম
বাঘা, রাজশাহী।

জবাব : ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রোপ বা কটূক্তি করা নিঃসন্দেহে কুফ্‌রী কাজ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "বলো! তোমরা আল্লাহ তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রোপ করছিলে? ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফ্‌রী করেছ"– ***(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)***। কেউ এরূপ করে ফেললে তাকে অবশ্যই তাওবাহ্ করতে হবে; অন্যথায় কুফ্‌রীর অপরাধে শাস্তির যোগ্য হবে। আর এ শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাবে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৭) : আমি জানি যে, কিয়ামতের ছোটো আলামতসমূহ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বড়ো আলামতের কোনো একটি কি প্রকাশ পেয়েছে?

গাজী নূর
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

জবাব : কিয়ামতের আলামতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। **এক-** ছোটো ছোটো আলামত। **দুই-** বড় আলামত। এ আলামতগুলোর তিনটি অবস্থা পরিলক্ষিত। (১) এমন কিছু আলামত, যা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। (২) এমন কিছু আলামত, যার কোনো কোনোটি প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রকাশ পাচ্ছে। এবং (৩) এমন কিছু আলামত যা, এখনো প্রকাশিত হয়নি। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

"إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ- الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ (ﷺ)، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ".

"নিশ্চয়ই যতক্ষণ না তোমরা ১০টি আলামত দেখবে, তার আগে কিয়ামত হবে না। অতঃপর (১০টি আলামত) উল্লেখ করে বলেন : ধোয়া নির্গত হওয়া, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, ভূগর্ভ হতে একটি অদ্ভুত প্রাণী বের হওয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা, 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের বিপর্যয়, পশ্চিমে একটি ভূমি ধস, আরব ভূখণ্ডে একটি ভূমিধ্বস এবং সর্বশেষ একটি আগুন ইয়ামান থেকে প্রকাশ পেয়ে সকল মানুষকে হাশ্‌রের মাঠের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া"– ***(মুসলিম- হা. ২৯০১)***। এগুলোর কোনো একটিও এখন পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

মসজিদে বেলাল

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

আল মাদীনা আল মুনাওওয়ারায় অবস্থিত ঐতিহাসিক একটি স্থাপনা মসজিদে বেলাল। এই মসজিদটি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর একজন ঘনিষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ সাহাবী বিলাল ইবনু রাবাহ্'র নামে নামকরণ করা হয়েছে। তিনি বেলাল হাফশি নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ নেতা উমাইয়া ইবনু খালফ-এর ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি তার মনিব দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হন। এমন কোনো বর্বর নির্যাতন ছিল না যা তার মনিব 'উমাইয়াহ্ ইবনু খালফ তার উপর করেনি। শত নির্যাতন করেও তাকে ইসলাম থেকে বিন্দুমাত্র দূরে সরানো যায়নি। পরবর্তীতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নির্দেশে বিপুল অর্থের বিনিময়ে আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে ক্রয় করেন এবং দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। হিজরতের পর আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনিই সর্বপ্রথম আযান দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন তাই তিনি ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সঙ্গী হিসেবে প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী হওয়ার অগ্রিম সুসংবাদও তিনি নিজ জীবদ্দশাতেই নবী (ﷺ)-এর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তবে এই বেলাল মাসজিদের সাথে বিলাল ইবনু রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কোনো স্মৃতি বা সম্পর্ক নেই। এই মসজিদটি আল মাদিনা আল মুনাওওয়ারার মসজিদে নববীর দক্ষিণ পাশেই অবস্থিত। মসজিদে নববী থেকে স্বল্প সময়েই জান্নাতুল বাকির সীমানা দিয়ে পায়ে হেঁটে মসজিদটিতে যাওয়া যায়। বেলাল মসজিদটি তিন তলাবিশিষ্ট, যার নিচতালা সম্পূর্ণটি মার্কেট। এই মার্কেটে পাওয়া যায় ছোটো শিশুদের জন্য অনেক ধরনের খেলনা সামগ্রী, সাথে রয়েছে বোরকা ও বাহারি ডিজাইনের চুরি নেকলেস আংটি চেইন বেসলেটসহ সব ধরনের স্বর্ণালঙ্কার এবং জায়নামায তসবিহ অন্য সব পণ্যও। মসজিদটির ভেতরের মার্কেট ছাড়াও বাইরের প্রাঙ্গণে রয়েছে খোলা বাজার। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কবর মোবারকের কাছে হওয়ায় মার্কেটটি বেশ জমজমাট থাকে সবসময়। মসজিদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় রয়েছে নারী-পুরুষের আলাদ আলাদা নামায আদায়ের সু-ব্যবস্থা। নারীদের নামাযের স্থানে পুরুষদের যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। মসজিদটির দ্বিতীয় তলার ভেতর দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় যাওয়া যায়, আবার বাইরের সিঁড়ি বেয়েও যাওয়া যায়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে হজ্জ ও 'উমরাহ্ করতে আসা দর্শনার্থীরা মসজিদে বেলাল দেখতে আসেন। তার মধ্যে কেউ সুন্নাত কেউ নফল যে যার মতো করে সময় অনুযায়ী নামায আদায় করে নেন। চোখ আটকে থাকার মতো সুনিপুণ কারুকাজ করা হয়েছে মসজিদের উপরের অংশটি। রয়েছে অনেক বড়ো বড়ো বিলাসবহুল ঝাড়বাতি। মেঝেতে বিছানো রয়েছে বাহারি রঙের কার্পেট। নামায আদায়ের স্থানের চারপাশে খাজকাটা তাকে কুরআন মাজীদ রাখা আছে, যেন কেউ ইচ্ছে করলে কুরআন পাঠ করতে পারে। মসজিদটির পরিবেশ সবসময় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া করার প্রতিদান জান্নাত

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তাগণ তার রূহ্ গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিশেষ কোনো নেক 'আমল করে এসেছ? সে বলল, না। তারা বলল, স্মরণ করার চেষ্টা করো। সে বলল, আমি লোকদেরকে ঋণ দিতাম। ঋণ আদায়ের জন্য যখন আমার প্রতিনিধিকে পাঠাতাম তখন তাদেরকে বলে দিতাম, ঋণ পরিশোধ যার জন্য কষ্টসাধ্য তাকে সময় দিবে; আর যে সক্ষম (কিছু কম দিলেও) তাকে ছাড় দিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরাও তাকে ছাড় দাও। *সহীহুল বুখারী- মা. শা., হা. ২০৭৭; সহীহ মুসলিম- মা. শা., হা. ২৬/১৫৬০।*

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

আগস্ট

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:০০	০৫:২৭	১২:০৬	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:১২
০২	০৪:০১	০৫:২৮	১২:০৬	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:১২
০৩	০৪:০১	০৫:২৮	১২:০৬	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:১১
০৪	০৪:০২	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:১১
০৫	০৪:০২	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:১০
০৬	০৪:০৩	০৫:৩০	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৯	০৮:০৯
০৭	০৪:০৪	০৫:৩০	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৯	০৮:০৯
০৮	০৪:০৪	০৫:৩০	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৮:০৮
০৯	০৪:০৫	০৫:৩১	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৮:০৭
১০	০৪:০৬	০৫:৩১	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৮:০৬
১১	০৪:০৬	০৫:৩২	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৮:০৬
১২	০৪:০৭	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৫	০৮:০৫
১৩	০৪:০৭	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৮:০৪
১৪	০৪:০৮	০৫:৩৩	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৮:০৩
১৫	০৪:০৯	০৫:৩৩	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৮:০৩
১৬	০৪:০৯	০৫:৩৪	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩২	০৮:০২
১৭	০৪:১০	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩১	০৮:০১
১৮	০৪:১০	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩০	০৮:০০
১৯	০৪:১১	০৫:৩৫	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৫৯
২০	০৪:১২	০৫:৩৫	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৫৯
২১	০৪:১২	০৫:৩৬	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৫৮
২২	০৪:১৩	০৫:৩৬	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৭	০৭:৫৭
২৩	০৪:১৩	০৫:৩৬	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৬	০৭:৫৬
২৪	০৪:১৪	০৫:৩৭	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৫	০৭:৫৫
২৫	০৪:১৪	০৫:৩৭	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৫৪
২৬	০৪:১৫	০৫:৩৭	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৩	০৭:৫৩
২৭	০৪:১৫	০৫:৩৮	১২:০১	০৩:২৭	০৬:২২	০৭:৫২
২৮	০৪:১৬	০৫:৩৮	১২:০১	০৩:২৭	০৬:২১	০৭:৫১
২৯	০৪:১৬	০৫:৩৮	১২:০০	০৩:২৭	০৬:২০	০৭:৫০
৩০	০৪:১৭	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৪৯
৩১	০৪:১৭	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৪৮